রবীন্দ্রনাথ

বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টন একবার বলেছিলেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে নবম বা দশম শতাব্দীর মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা বড়ই কঠিন, কারণ রাষ্ট্রে, সমাজে, কার্যে, চিন্তায় ও ধর্মে তারা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ—বর্তমান যুগের মানুষের সঙ্গে তাদের কোথাও কোনো মিল নেই। এই মূলসূত্রটি মনে রাখলে ইতিহাসের যে সকল অবিচার, নৃশংসতা ও অকারণ রক্তলোভের কাহিনী আজকাল আমাদের দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হবে, কারণ সে যুগের মনোবৃত্তির সঙ্গে এদের কার্যকারণ সম্পর্কটুকু আমরা আবিষ্কার করে ফেলবো।

লর্ড অ্যাক্টনের উক্তিটি ব্যাপকভাবে যদি গ্রহণ করি এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটুকু বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে এই দাঁড়ায় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী যতই পার হয়ে যাচ্চে, মানুষ ততই দ্রুত এগিয়ে চলেচে—একযুগের গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার অন্যযুগের মানুষের পক্ষে পরম বিস্ময়ের বস্তু, এ যুগের মিরাকল পরবর্তী যুগের সুপরিচিত দৈনিক ঘটনা—সহস্র শতাব্দীর পারের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে তার যাত্রা, এখন সে গৌরবময় বিবর্তনের কাহিনী আমাদের কল্পনারও অতীত।

বিশ্বমানবের এই অগ্রগতির সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন লোক আসেন, যাঁরা একাধারে মানুষের সকল দিকে সকল পরিণতির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সেই রকম একটি মানুষ। যে অসীমতার তৃষ্ণা মানুষের এই অগ্রগমনের সাথী ও পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দিয়ে তা আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম একটি মৌলিক রূপ ধরে দেখা দিয়েচে। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশের লেখকের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে হলে প্রতীচীর সেই শ্রেণীর লেখককে মাপকাঠি রূপে ব্যবহার করা হোত—এইটাই ছিল সাহিত্যে তাদের স্থাননির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। তাই দেশবাসীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার সার ওয়াল্টার স্কট্, মধুসূদনকে বাংলার মিল্টন, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাংলার এমার্সন নামে অভিহিত করে সাহিত্যে তাঁদের স্থান সুনিপুণভাবে নির্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েচে ভেবে পরম আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। আমাদের সাহিত্যের এই পরমুখাপেক্ষী দাসমনোবৃত্তি দূর করলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার অমিত তেজে—তাঁর স্থান এ ধরনে নির্দেশে করতে কেউ সাহস করলে না— মানুষ সেখানে দিশাহারা হয়ে পড়ল, গতযুগের মাপকাঠির উপর আস্থা হারাল, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তারা নিশ্চিন্ত মুরুব্বিয়ানার সুরে তাঁকে বাংলার শেলী কি বাংলার মেটারলিঙ্ক বলতে পারলে না, রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন একটি unclassified phenomemnon—অমুক শেল্‌ফের অমুক নম্বরের অমুক তাকে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দিষ্ট করা চলল না সহজে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। একটা কথাই এখানে বলি। আমার হাতের কাছে একখানা বাংলা উপন্যাস রয়েচে, নাম 'বিজয় বল্লভ', ১৮৮০ সালে সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। লেখক ভূমিকায় বলেচেন, "ইংলন্ডীয় ভাষায় নবেল নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থসকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে" ইত্যাদি। উপাখ্যানভাগ অবশ্য কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত, প্রকৃত বর্ণনার মধ্যে পাই Decadent যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরনের বাঁধিগৎ। পূর্ণিমা থেকে কোকিলের কুহু পর্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি-বর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত নয়, কিন্তু সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর বাহুল্যবর্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত; অসাধারণ চক্ষুষমান প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনাপদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড় বলে মেনেচে; সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing—পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন সেখানে

একদিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায়, অন্যদিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে দিগ্বিজয়ে বার হবার অদম্য স্ফূর্তিকে লাভ করে।

জীবনের ও জগতের ব্যাপারে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই সর্বপ্রথম। আমাদের সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল অত্যন্ত খর্ব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের সাধনায় তাঁর স্ট্যান্ডার্ড এত উঁচু করে দিয়েছেন—সাধারণ গতিতে চলতে চলতে হয়তো দেড়শো বছরেও তা ঘট্‌ত কিনা সন্দেহ। তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক জিনিসটি নতুন করে দেখেচে, বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কার করেচে দৃষ্টির সঙ্গেই নবসৃষ্টির সূচনা হয়েচে। এমন একটি জীবন্ত, সদাজাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাই, পদ্মাবুকের বজ্‌রার কামরায় যা নিদ্রিত হয়ে পড়েনি—নির্জন রাত্রে রহস্যময়ী প্রকৃতি কখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, কখন তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি দেখা হবে—তারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেচে।

রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই, জীবনের এমন কোনো দিকও নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, যার সম্বন্ধে তিনি কিছু-না-কিছু নতুন কথা না শুনিয়েচেন, তা শরৎকালীন দুপুর সম্বন্ধেই হোক, বা নাম উচ্চারণ করার পদ্ধতি নিয়েই হোক। এ যুগের বাংলার কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধ লেখক—তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেচেন তিনি, রূপ দিয়েচেন তিনি—বিশ্লেষণ করে দেখলে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়বেই।

একটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আজ বিশ্বের দরবারে সকলের আসনে বসিয়েচেন, এই বিপুল দানের, মানবপ্রতিভার এই অনন্যসাধারণ বিকাশের তুলনা নেই বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে।

তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে যে প্রগাঢ় অনুভূতি, তা সাধারণ মনের ব্যাপারনয়, চেতনা ও অনুভূতির সে স্তর সাধারণের দুরধিগম্য—তাই তাঁর কাছে আমরা যে লোকের সন্ধান পাই, আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতি পরম্পরার বহু ঊর্ধ্বে সে এক অপরূপ আনন্দলোক—তাঁকে পথপ্রদর্শক না পেলে সেটা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই রয়ে যেত চিরদিন। জাতীয় চেতনার এই অগ্রগতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিকট অপরিসীম ঋণে ঋণী—গত শতাব্দীর অলঙ্কার ও অনুপ্রাস-বহুল বাংলা কাব্যের কথা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্বের কাব্যের সহিত তাঁর যে তফাত, তা বল্মীকস্তূপ ও হিমালয়ের তফাত। অনুভূতির এই অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কথা ভেবে শুধুই এই কথা মনে হয়—এক জীবনে এত বিপুল রসাস্বাদ কি করে সম্ভব হোল, তখুনি আবার তাঁরই কথায় তাঁকে বলতে ইচ্ছা করে—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ

জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস।

রবি-প্রশস্তি

বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় এ সাহিত্য যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। এ কথা আজ আমরা সগর্বে ঘোষণা করিয়া ধন্য হইতেছি। সীমাসংখ্যাহীন অবদান পরম্পরায় রবীন্দ্রসাহিত্য মহনীয়। জগতের কোনো একটি বিশেষ লেখক সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এমনই বহুমুখী যে অল্প পরিসরের মধ্যে সে বিরাট সাহিত্যপ্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। কাব্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, সমালোচনায়, ধর্মসম্বন্ধীয় নিবন্ধে, পরিভাষা সঙ্কলনে—সাহিত্যের এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যাহা তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। বাংলা সাহিত্যের বিরাট মানদণ্ডস্বরূপ যে রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ আমাদের মুগ্ধ চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশমান, নগাধিরাজ হিমালয়ের মত তাহার উত্তুঙ্গ শিখরদেশ সাধারণ দৃষ্টির নাগালের বাহিরের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল প্রেরণা সৌন্দর্য ও অনুভূতি। তাহার বাহ্য অলঙ্কার প্রকাশ হইয়াছে অপূর্ব শব্দ-চয়ন, ছন্দধ্বনি ও অলঙ্কার প্রকাশের কৌশলের দ্বারা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্যগুলির মূল ভিত্তি হইতেছে সৌন্দর্যানুভূতি। Leonardo-র Gioconda অথবা বেঠোফোনের পরিকল্পিত Symphony-র যে সৌন্দর্য, ইহাদের প্রথমটির মূলে আছে রেখা ও বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ ও দ্বিতীয়টির মূলে সুকৌশল ধ্বনি-সমন্বয়। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে এই দুইটি শিল্প-কার্য আমাদের চিত্তে যে কল্পলোক রচনাকরে তাহা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র দৃশ্যমান বর্ণ-সমষ্টি বা শ্রুতধ্বনি সমষ্টি উদ্ভূত হইতে পারে না। বস্তুত এই আনন্দলোক সৃষ্টির মূলে আছে, এই ধ্বনি ও বর্ণনাতীত কোনো অদৃশ্য প্রভাব এবং একটি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। আবার, যদিও এই বর্ণ ও ধ্বনির মাধ্যমেই সেই অতীন্দ্রিয় আত্মিক অনুভূতির বিকাশ সম্ভব হয়, ইহাও নিশ্চিত যে এই অনুভূতি বর্ণ ও ধ্বনির বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত এক মহত্তর সত্য। কবি রসবন্ধ বাক্য পাঠ করিয়া বা রচনা করিয়া যে আনন্দানুভূতির সন্ধান পান একজন খ্রিস্ট, বুদ্ধ অথবা চৈতন্য সদৃশ ব্যক্তি বিশুদ্ধ আত্মিক উপলব্ধির পথেই সে আনন্দের সন্ধান পাইতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষমতা নিম্নতর কোনো মানুষের আয়ত্ত হইবার কথা নয়। কাব্য-সাহিত্যের এই মূল সূত্রটি দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভগীরথের ন্যায় নবতীর্থ-জল আনিয়াছেন তাঁহার প্রতিভার গভীর শঙ্খধ্বনির সহযোগে। এই জাতির মর্মস্থল তাঁহার চিন্তার আলোক-পাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় প্রতিভার চারণ তিনি। দেশে যে প্রতিভার সৃষ্টি আদর লাভ করিয়াছে, যে ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছিলেন—উপনিষদ্ তাঁহার জীবনে সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে, মৃত্যুতেও তাহাই হইবে, যে ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি শকুন্তলা পাঠ করিয়া কবিবর গ্যেটে বলিয়াছেন—যদি কেহ এক স্থানে শরতের বসন্তের সম্পদ—স্বর্গের ও মর্তের মিলন প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শকুন্তলা পাঠ করিলে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হইবে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় প্রতিভার মূর্ত প্রতীক; নানাভাবে নানারূপে ভারতীয় অনুভূতি ও ভাবরাশিকে তিনি প্রতীচ্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার আলোকরশ্মি-সম্পাতে সাহিত্যের যে শাখায় তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই সোনা হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ তাঁহার ছোট গল্পগুলির কথা বলিব। ছোট গল্প বলিয়া কোনো জিনিস রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। যাহা ছিল, তাহা ছোট গল্প নহে, কাহিনী। অথবা অসার্থক উপন্যাসের কয়েকটি অধ্যায়। কাহিনী এবং ছোট গল্পে প্রভেদ বিস্তর। ছোট গল্প একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি "কথা"-র। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে "কথা" ছিল। যেমন, কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্র। দণ্ডীর দশকুমারচরিত। গোঢ়লকৃত উদয়-সুন্দরী কথা ইত্যাদি। ছোট গল্প এই শ্রেণীর "কথা" নয়। ইহাতে একটি বিশেষ ধরনের আর্ট প্রকাশিত। অথবা যে কথা এইরূপ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে তাহাই ছোট গল্প। যে কথায় এই মাধ্যম ব্যবহৃত হয় নাই তাহা ছোট গল্পে নহে। কাহিনী মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী সাহিত্যে conte বলিয়া এক শ্রেণীর 'কথা' বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আলফাঁস দোদে প্রভৃতি ক্ষমতাশালী কথা লেখকের হাতে conte অপূর্ব সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই conte ক্রমে ফরাসী দেশ হইতে ইউরোপের সর্বস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইহা একটি অদ্ভুত সৃষ্টি।ফরাসী conte বিভিন্ন দেশে গিয়া তাহার রূপ বদলাইয়া ফেলিল; বিভিন্ন লেখকের হাতে একটু আধটু অদল বদল হইতে লাগিল। তথাপি এই মাধ্যমের মূল কৌশলটি সকলেই যথাযথ ভাবে অভ্যাস করিলেন। এই মূল-কৌশলটি হইল ছোট গল্পের 'মুহূর্ত' বাmoment। এই মুহূর্ত সৃষ্টিই ছোট গল্পের আর্টের প্রাণ-বস্তু। যিনি ইহা যত যথাযথরূপে ও যত সুষ্ঠুভাবে খাটাইতে পারেন, ছোট গল্প লেখক হিসাবে তিনি তত সক্ষম, একথা অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে conte আমদানি করিলেন, যাহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম গল্পগুচ্ছের অপূর্ব গল্পগুলি। ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকায় তাঁহার প্রথম ছোট গল্প 'ভিখারিণী' বাহির হয়। পরে পরে তাঁহার ছোট গল্পগুলি বাহির হইতে লাগিল। তখন বাঙালি পাঠকের মনে সেগুলি একটি নূতন রাগিণীর মত ধ্বনিলোক সৃজন করিয়া চলিল।

ফরাসী সাহিত্যের গল্পের নিয়মগুলি এত স্থিতিশীল ও সুনির্দিষ্ট যে তাহার সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্রমগুলির তুলনা করা চলে। প্রথম অংশটি 'ভূমিকা', দ্বিতীয় অংশ 'সম্প্রসারণ', তৃতীয় অংশ 'পুনরাবৃত্তি', চতুর্থ অংশ 'বিরতি' ও সর্বশেষ অংশ koda বা 'ক্লাইম্যাক্স'। ছোট গল্পের বিভিন্ন অংশেও এইরূপ ক্রম বজায় রাখিতেই হইত; এবং এই স্বর্ণ-নিগড়ের মধ্যে বন্দিনী কথা-সরস্বতী শিল্পীর সাধনা ও উপাসনায়পরিতুষ্টা হইয়া যে অমর বর দান করিতেন শিল্পীকে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা পাই জুল ক্লারেৎ, ফ্রাঁমোয়া কোম্প, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আনাতোল ফ্রাঁসের অনবদ্য ছোট গল্পগুলি। আনাতোল ফ্রাঁসের 'জুডিয়ার শাসনকর্তা' নামক অপূর্ব গল্পটিকে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা ছোটগল্প-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাতে ছোট গল্পের ক্রমগুলিকে গোঁড়া শিল্পীর মত মানিয়া লইয়াও শেষ অনুচ্ছেদে লেখক একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মুহূর্তের সৃষ্টি করিয়া ছোট গল্প শিল্পের প্রকৃত রূপটিকে সর্বসমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট গল্প এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত ফরাসী আর্ট। যেমন অপূর্ব তাহার পরিবেশ, তেমনি অপূর্বতর তাহার মুহূর্ত সৃষ্টি। মুহূর্ত সৃষ্টির সাহায্যেই ছোট গল্প অমর হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অমর মুহূর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পোস্ট মাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'দৃষ্টিদান', 'ব্যবধান' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলিতে। এই মুহূর্তগুলি এতই সুস্পষ্ট ও যথাযথ, যে কখনও ছোটগল্প পড়ে নাই বা ছোটগল্পের আর্ট যে জানে না—সেও এগুলির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি অনুভূতিপ্রধান, সে যুগে বড় বড় শিল্পীদের গল্প ছিল এ ধরনের সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিবেশনের মাধ্যম, এ যুগে প্রতীচ্য শিল্পীদের মধ্যে ক্যাথারিন ম্যান্‌সফিল্ডের গল্পগুলি এ দিক দিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য অনুভূতিপ্রধান না হইয়া ঘটনাপ্রধান হইয়াও ছোট গল্প সাফল্য অর্জন করিতে পারে এবং ভাল ভাবেই পারে—তাহার প্রমাণ আধুনিক যুগের অধিকাংশলেখকের গল্প। রবীন্দ্রনাথের ঘটনাপ্রধান গল্পের মধ্যে 'গুপ্তধন'-এর কথা হঠাৎ মনে পড়িল। এই গল্পটাকে আধুনিক কালের ঘটনাপ্রধান যে কোনো ছোট গল্পের মধ্যে সাদরে ও সসম্মানে চালানো যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মধ্যে ফরাসী conte আর ধ্বনিত হয় নাই, যেমন বৈষ্ণবী প্রভৃতি গল্প। ফরাসী শিল্পের মায়াশৃঙ্খল সবলে ছিন্ন করিয়া তাঁহার শক্তিশালী মন তখন গল্প লিখিবার নিজস্ব একটি অপূর্ব ধারা আবিষ্কার করিয়াছে যাহার চরম পরিণতি আমরা দেখিতে পাই 'চতুরঙ্গ' এবং 'দামিনী', 'শ্রীবিলাস', 'জ্যাঠামশাই' প্রভৃতির মধ্যে। ইহারা পৃথক পৃথক গল্প নয়। একই সূত্রে গ্রথিত কয়েকটি অমূল্য মণির নিপুণ হার—শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 'চতুরঙ্গ'-এর জুড়ি মেলা ভার। 'চতুরঙ্গ'-এর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ শ্রেণীর আয়ত্তের বাহিরে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখী দিকের একটি মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। সমস্ত দিকের সম্বন্ধে বলিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কালেও তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি সে-যুগের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই এই অদ্ভুত বালক ও কিশোর সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চের সাধারণী হইতে নিম্নোদ্ধৃতঅংশই বিশিষ্ট প্রমাণ।

"আমরা নিরাশ মনে নবগোপালবাবুকে অভিসম্পাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু দিল্লির দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা ও একটি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ে দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা ও গল্পটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্রনাথ তখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত ও আদ্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। একজন সুপরিচিত কবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবেন, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্নলাভ হইবে।"

এই কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' গ্রন্থের চতুর্থভাগে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে [বস্তুত ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ] আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনো উদ্যানে "নেশনাল্ মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম।...একজন সদ্যপরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮/১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। হাসিমুখে করমর্দন কার্যটি শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"

যে রবীন্দ্রনাথের যশঃগৌরব উত্তরকালে সমগ্র জগতে পরিব্যপ্ত হইবে—সেই রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে খ্যাতিলোলুপ অকুণ্ঠ মনের সমস্ত উৎসাহ ঢালিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিদের নিজে যাচিয়া যাচিয়া কবিতা শোনাইতেছেন ও গান গাহিতেছেন—এ ছবিটি আমাদের বড় মুগ্ধ করে। কল্পনানেত্রে আমরা দেখিতে পাই হিন্দুমেলায় লোকের ভিড়ের আড়ালে একটি নিভৃত বৃক্ষতলে দণ্ডয়মান যশঃলোলুপ সলজ্জকণ্ঠ কিশোররবীন্দ্রনাথকে। নবীনচন্দ্র সেনের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কথা শেষ হইবার নয়, সে চেষ্টা করিব না। তবে একটি কথা না বলিলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না—সেটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশ্ব-প্রকৃতির অদ্ভুত প্রভাব। তাঁহার সারা কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই দুইটি উৎসুক নেত্রের পিপাসু দৃষ্টির পরিচয় ও তাহাদের রস দর্শন করিবার লোকোত্তর ক্ষমতা। উপনিষদের ঋষিরা ভারতের কোন্ সুপ্রাচীন বনান্তস্থলীতে বসিয়া নিভৃত ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, জগতের সত্যমূর্তি 'রসো বৈ সুঃ'। কিংবা 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে'।

আজ এই ব্ল্যাকমার্কেটের দিনে, পরস্পর পদগৌরবলোলুপতার হানাহানির দিনে, স্বার্থান্বেষী ভক্তদিগের মিথ্যাবাদিতার দিনে, কে বুঝিবে উদাসীনতার এই সেই অমর বাণী। প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা গন্ধমধুর অন্ধকারের পথে দাঁড়াইয়া বন, আকাশ, নক্ষত্র ও নদীতটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি অহো', বিশ্বদেবতার এই অমরকাব্য প্রত্যক্ষ কর, যা কখনও জীর্ণ হয় না, কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। চিরানন্দলোক হইতে আমাদের চিরনির্বাসন। মানব প্রকৃতির মিলন তীর্থ নাই। আজিকার দিনে রবীন্দ্র সাহিত্যের এই একটি অতি বিরাট দিককে আমরা চিনিতে পারিব কজন? যাহাদের পেটে অন্ন নাই, দৈনন্দিন অন্ন-সংস্থানের জন্য যাঁহাদের ছুটাছুটি করিতে হয় দু-বেলা, তাঁহাদের বনান্ত শীর্ষে বসন্তের শিহরণ দেখিবার অবকাশ নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সহস্র হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটিপতি হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাঁহাদেরই বা রবীন্দ্রকাব্যের এই অমৃতলোকে বিচরণ করিবার সময় কোথায়?

কবিগুরুকে আজ আমাদের অভিনন্দন জানাই। তিনি প্রকৃতির সহিত শিশুমনের সংযোগ সাধন করিবার জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গড়িয়াছিলেন। মুক্ত বাতাসে ছায়াঘন আম্রকুঞ্জে যাহাতে শিশুরা বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, শৈশবে মাহেন্দ্রক্ষণে যাহাতেশিশু দুইচোখ মেলিয়া সুন্দর বিশ্বের দিকে চাহিতে শিখে, ইহাই ছিল তাঁর এইধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা শান্তিনিকেতন অমর হোক ও সেই সঙ্গে আমাদের বস্তুবাদী জীবনযাত্রার পথ কিছু ঘুরিয়া যাক। আমরা যেন রবীন্দ্র উৎসবকে প্রাণশূন্য হুজুকে পরিণত না করি, যেন তাঁহার কাব্য আমাদের করে দৃষ্টিদান এবং সে দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্বদেবতার অমর কাব্য যাহার ক্ষয় নাই ও যাহা জীর্ণ হয় না—তাহা পাঠ করিবার ক্ষমতা লাভ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের নামে একটি রাজপথ বা একটি উদ্যান অথবা একটি নগরী করিয়া তাঁহার জন্মদিনে অবকাশ ঘোষণা করিয়া আমরা তাঁহাকে কতটুকু সম্মান দেখাইতে পারিব? তাঁহার অমর কীর্তি তাঁহার রচনাবলী বহু যুগ-যুগান্তরলোকে তাঁহার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। আমাদের ইট কাঠ পাথরের স্মৃতি-স্তম্ভ অতদূর যাইতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না।

হে অমর কবি, স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া আমরা শুভ ২৫শে বৈশাখে তোমার কথাটি স্মরণ করি। তুমি দেশের মুক্তি সাধনার অন্যতম অগ্রদূত, কিন্তু স্বাধীন দেশকে তুমি দেখিয়া যাও নাই। আজ তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন বিশ্বের মাঝে সগৌরবে দাঁড়াইবার শক্তি আমরা লাভ করি। দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য যেন আমাদের আচরণে লজ্জিত হইয়া না পড়ে। আমরা তোমাকে অন্তরের সাদর অভিনন্দন জানাই।

প্রথম দর্শন

আজ প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা।

কলকাতায় সবে এসেছি কলেজে পড়তে। রাস্তাঘাট তখনও ভাল চিনি না, একদিন দুপুরবেলা কলেজে কে বললে, আজ সেন্ট পল্‌স হোস্টেলে রবিবাবু আসবেন— দেখতে যাবে?

রবি ঠাকুর! ইন্দ্রজাল ছিল ও নামে মাখানো আমার বাল্যকাল থেকে। কারণ বলছি। আমার বয়েস যখন আট কিংবা নয়, পাঠশালায় পড়ি আপার প্রাইমারি—তখন আমাদের হেডমাস্টার গগনচন্দ্র পাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধের মত গগনচন্দ্র পালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলাম। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি-গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনি নি। যেন একটি অপূর্ব সঙ্গীত—অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত—অশ্রুতপূর্ব বাণী। হেড-মাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম 'বঙ্গে শরৎ'—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে। এবং এই নামটির সঙ্গে বাল্যকালে শ্রুত সেই কবিতাটির অপরিচিত সৌন্দর্য মিশে গিয়ে ওই নামটির চারিপাশে একটি মায়ালোক গড়ে উঠল আমার মনেসেই দিন থেকেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মায়ালোকের মানুষ। যখন আমি হাই-স্কুলের ছাত্র, তখন তিনি নোবেল-প্রাইজ পান, তাঁর কবি-খ্যাতির কথা তখন যথেষ্ট শুনলেও, তাঁর রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে নি তখনও, কারণ যে সময়ের কথা বলছি, মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে রবীন্দ্রনাথের রচনা তত প্রসার লাভ করেনি সে সময়ে। মনে আছে, সে সময়ে গর্ব অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে, আমাদেরই একজন আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন, সাহেবেরা দেখুন আমরা ছোট নই। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলা দেশের তথা সারা ভারতবর্ষের সম্মান—আমাদের সম্মান।

সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন সেন্ট পল্‌স কলেজের হোস্টেলের সামনের মাঠে—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, বেলা বিশেষ পড়েনি—তিনটে হবে। মাঠে তাঁর জন্যে চেয়ার টেবিল পড়েছে। আমরা সেই টেবিলের দুই পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন পেছনে ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, সৌম্য সুন্দর মূর্তি। তাঁর আগে ছবিতে তাঁর চেহারা দেখেছি অনেকবার, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হলো কোনো ফোটোই তাঁর প্রতি সুবিচার করেনি। কি একটি অনন্যসাধারণ দীপ্ত দৃষ্টি চোখে, চিবুকের নিচে শ্মশ্রুরাজির বাঁকা ভার। একেবারে তাঁর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকট সান্নিধ্য-লাভের আনন্দে তখন আমি আত্মহারা। দেশে গিয়ে গল্প করবার মত একটা ঘটনা বটে আজ। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ছেলেবেলায় তাঁর কবিতা গগন পালের মুখে প্রথম শুনে মুগ্ধ হই।

বেশ মনে আছে, হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কেনেডি সাহেব রবীন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে বড় একটা কাঁচের জগ ভর্তি করে জল ও একটা গ্লাস রাখলেন! দেখে সকৌতুকে ভাবলাম, দেখ কেনেডি সাহেবের কাণ্ড! অতটা জল কি খাওয়ার দরকার হবে ওঁর?

রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতে যেন চমকে উঠলাম, তারপর যতই শুনি, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নি, মনে হলো এ কণ্ঠস্বর অসাধারণ, জীবনে এই এমন কণ্ঠস্বর কানে গেল, যা হাজার লোকের মধ্যেও পৃথক করে চিনে নেওয়া চলবে।

তাঁর বক্তৃতার আর কোনো কথা আমার মনে নেই, বহুদিনের কথা—কেবল মনে আছে, তিনি বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা অনবদ্য ভঙ্গিতে ডান হাত নেড়ে চাঁপার কলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে (যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, সবাই জানেন তাঁর আঙুল দেখলে চাঁপার কলির কথা মনে হত) একটি সুশ্রী মুদ্রা রচনা করে বললেন, "কল্পলোক... কল্পলোক"—কয়েকবার তিনি কথাটি ব্যবহার করলেন বক্তৃতার মধ্যে, আরও অনেক কিছু বলেছিলেন মনে নেই।

একটা কথা মনে আছে। সে দিন সেন্ট পল্‌স হোস্টেলের মাঠে কিন্তু তেমন ভিড় হয়নি, অন্তত যেমন ভিড় দেখেছিলুম ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁর বক্তৃতার সময়, ইউরোপ থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই কৌতূহলী জনতার চাপে ইনস্টিটিউটের দরজা ও রেলিং সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। হোস্টেলের মাঠে ক্রমে ছায়া পড়ে এল। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই ঠেলা ঠেলি করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম, পায়ে তাঁর চকচকে বাদামী চামড়ার জুতো ছিল—সে কথা আজও ভুলি নি।

পরবর্তী কালে যখন তাঁর কাছে বসে কথাও বলেছি, তখনও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কখনই মনে করতে পারি নি, ইনি আমাদের পাঁচজনের মত মানুষ। আমার বাল্যমনের রঙে রাঙানো কল্পলোকের দেবতা হয়ে তিনি চিরদিন রইলেন আমার কাছে— তিনি সাধারণ লোক নন, তিনি অতি-মানব, তিনি রবি ঠাকুর।

সাহিত্যে বাস্তবতা

সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা একটি বড় জিনিস। একই ঘটনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বা পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রকার রসের সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার নিমিত্ত যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে ভূয়োদর্শন। জীবনের নানা বিচিত্র দিকের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হয়ে উঠবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তত স্বচ্ছ হবে। তারুণ্যের স্পর্ধায় একদিন যে বিশেষ মতবাদকে নিন্দা করে এসেছি, প্রৌঢ় মনের অভিজ্ঞতার আলোকে সে মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে শিখবো। সাধারণ বুদ্ধির অতীত আর একটি চৈতন্য বিদ্যমান। সাধকের সপ্তম-ভূমির মত এই চৈতন্যও দুষ্প্রাপ্য ও দুরধিগম্য। তপস্যা দ্বারা একে লাভ করতে হয়। তেমনি একে বুঝতে হলেও তপস্যার প্রয়োজন। মহাপ্রতিভাশালী বহু লেখকের অনেক রচনা সেজন্যে সাধারণে বুঝতে পারেন না। কেমন করে পারবেন? তিনি যে-লেখকের সংবাদ কথায় বা চিত্রে বা সুরে আমাদের কাছে পরিবেশন করতে চাইবেন, সে-লোক হয়তো তাঁর কাছেও সদ্য পরিচয়ের রহস্য কুহেলিকায় তখনও আবৃত। সে গভীর লোকের খবর ভাষার বন্ধনে বন্দী করে প্রচলিত উপমা-সাহায্যে প্রকাশ করা তাঁর কাছেও তখন একটি কঠিন সমস্যা। হঠাৎ বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে চায় না সে অনুভূতি। অনেক অনুভূতি আবার এত অল্পক্ষণ স্থায়ী যে, তার স্থায়িত্বকালে তাকে প্রকাশ করবার সময় হয় না। স্মৃতির সাহায্যে হারানো মুহূর্তটির আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়তো তার অখণ্ডতা বজায় থাকে না। হয়তো সেই হারিয়ে ফেলার দরুন কিছু ভুলচুকও হয়। তবুও প্রতিভাশালী লেখকেরাই তা প্রকাশ করতে সমর্থ তাঁদের প্রকাশ-নিপুণতা দ্বারা, তাঁদের ভাষার ঐশ্বর্য দ্বারা, তাঁদের সহজাত স্থাপন-ক্ষমতা দ্বারা। অক্ষম লেখকের লেখনী সে জিনিসের নাগাল পায় না। ক্ষমতাবান লেখককেও অবুঝের গালাগাল সহ্য করতে হয়। বহুপ্রতিভাশালী লেখকের ভাগ্যেই এ ঘটনা ঘটচে। যাঁরাই আজ সাহিত্যজগতের খবর রাখছেন, তাঁরা এটি জানেন।

আজ রবীন্দ্রনাথের কথা তাই বিশেষ মনে পড়ে।

বাংলার রবীন্দ্রনাথ, বাঙালির রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সম্পদ ছিলেন, বাঙালি আমরা এখনও তাঁকে বুঝতে পারি নি। তাঁর যে বিরাট আদর্শ আমাদের সামনে হিমালয়ের সমান উঁচু হয়ে অবস্থান করছে তার পাশে মেকী সাহিত্যের ও ধার করা বিদেশী আদর্শের কল্পনাকে বসাতে আমরা যেন লজ্জা বোধ করি; পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য করে, আমাদের বাস্তব সমস্যাকে উপেক্ষা করে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সাহিত্যের আদর্শ আমদানী করতে যেন ইতস্তত করি। উৎকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠাই যে সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয়, রবীন্দ্রনাথের পরেও কি বাঙালিকে তা মনে করিয়ে দিতে হবে? রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের স্বভাবসুলভ হুজুক-প্রিয়তার কেন্দ্র না করে তুলে প্রকৃতপক্ষে যে সংস্কৃতির ও যে উদার মন্ত্রের তিনি ঋষি ছিলেন—কি আর্টে, কি জীবনে, কি ধর্মে—আমরা যেন

সেই মন্ত্রের সাধনা শুরু করি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির নব মেরুদণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; আমরা হুজুক করে বেড়াই বটে, সেই মেরুদণ্ডের সন্ধান এখনও পেয়েছি কি?

সাহিত্য সমাজের মাপকাঠি। সমাজের বাস্তবপটভূমিতে যে রসশিল্প রচিত হয়, শিল্পীমানসের প্রকাশ-ভূমি যা, তাই সাহিত্য। রাজনীতি আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র সব চেয়ে বড় স্থান অধিকার করে রয়েচে। সমাজের বেশির ভাগ লোক সকালে উঠে পড়েন দৈনিক খবরের কাগজ। তাতে যে আস্বাদ পান, সাহিত্যের মধ্যেও কি তাকেই খুঁজতে হবে?আধুনিক দিনের সমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে এবং হচ্চেও। 'রেইন-বো'র মত বড় উপন্যাসও তৈরি হয়েচে যুদ্ধের আবহাওয়ায়। প্যারিসে জার্মান অধিকারের দুঃস্বপ্ন লুই ব্রমফিল্ডকে প্রলুব্ধ করেচে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসখানি লিখতে।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যজাতির সমস্যা অন্যরূপ। তারা যত ভীষণ দুঃখ অনাচার সহ্য করেচে বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে, আমরা ততটা দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করি নি। আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপক সত্তা ছিল না। যে দুটি জিনিস খুব বেশি দোলা দিয়েচে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে—ব্ল্যাকমার্কেট ও মন্বন্তর—সে দুটি বহু লেখকের উপজীব্য স্বরূপে একই করুণ রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মত বিস্বাদ হয়ে পড়েচে ক্রমশ। তবু স্বীকার করতে হবে তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। শাশ্বত সাহিত্যের পথে এ রচনাগুলি পা বাড়িয়ে রয়েচে।

একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে লেখা আসে কবি-মানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবি-মানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার সৃষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকেরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেদিন সেই প্রসারিত চেতনা তাঁদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজ সমস্যাকে আশ্রয় করে গল্পও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ বহু লেখকের সাম্প্রতিক রচনায় সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেচে। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের সমস্যাগুলিকে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্ছে। বহু লেখার আবশ্যক কি? একখানি সার্থক রচনায় এক এক যুগকে অময় করে রাখে। যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার দুঃখদুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেচে ওয়েলেঙ্কির বিখ্যাত উপন্যাসখানিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র-আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা এ সব রচনাকে অপূর্ব আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে যুগ প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে দিয়েচে। চেতনা যে কি ভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিতে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

একটা যুগ চলে যাচ্চে, ভেঙে যাচ্চে—এ খুব সত্যি কথা। এযুগে স্বভাবতই কবি বা শিল্পী-মানস কিছু অব্যবস্থিত। নতুন সময়ের আভাসে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেচে, এমন মন এখন হয়তো বিরল। হয়তো অত্যন্ত নিকট থেকে দেখছি বলে অনেক নতুন রচনাকে, অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্টকে আমরা বাজে আধুনিকতা বলে ভুল করচি। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' যখন রচিত হয়েছিল, তখন সেকালের অনেক বিজ্ঞ সমালোচক বলেছিলেন, "মহাভারতের কথা নিয়ে এ আবার কি রকম কাব্যি?" আমরা আবার যেন প্রশ্নকর্তাদের দলে না পড়ি। কবি-মানস কোনোদিন হুজুকের বশীভূত হবেন না। দুদিনের হাততালিকে অবজ্ঞা করলেও তাঁর চলবে। অনর্থক কালাপাহাড়ি যেখানে সেখানে তাঁর সত্য শুভ্র ও কল্যাণদৃষ্টি কখনও সায় দেবে না। শিল্পীর সকল রচনার মধ্যে থাকবে একটি চরিত্র। রচনার ওপর এই চারিত্রের দৃঢ় ছাপই পাঠকের মনে এনে দেবে নিঃসংশয় নির্ভরশীলতা।

এ আমরা যেন আদৌ ভুলিনে যে কোন রচনায় আধুনিক যুগের সমস্যা আছে কিনা, রাজনীতির ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ না ঘোলাটে, দুর্ভিক্ষের কথা ঠিক করে বলা হলো কিনা— এ সব দেখে সাহিত্য বিচার হয় না। আজকাল নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেচে, মন হয়ে এসেচে নিস্তেজ। সমালোচনার আদর্শ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াচ্চে। জীবনের শাশ্বত ধ্রুব সত্যকে আমরা এখন অস্বীকার করে চলেচি। যে দেশে গীতার মত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যা আজ দেড় হাজার বৎসর ধরে স্বকীয় আলোয় উদ্ভাসিত, কতশত মনীষীর ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনীর অর্ঘ্যপুষ্পে যা এই দীর্ঘ দিন ধরে সৃজিত হয়ে এসেচে—আজ আমাদের দুর্ভাগ্য সেই দেশের

সাহিত্যের আদর্শ আমাদের আমদানি করতে হয় সমুদ্রপারের দেশ থেকে। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য যে এক জিনিস নয় এ কথা আমরা ভুলতে বসেচি। সেদিনও আমাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; যে শুদ্ধ নির্মল পরিবেশ ও উদার শুভবুদ্ধি শিল্পী-মানসের একমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয়, তিনি তার আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে; তাঁর তপস্যাস্তব্ধ, মৌনমুখর মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে দিনশেষের কল্যাণরাগিণী কেমন নানাভাবে অরূপের ও রূপের ঐশ্বর্য বিস্তার করেচে তাঁর লেখনীর লীলা বিলাসের ছন্দে, আমরা সাহিত্যকেপলিটিকসের দিন-মজুরীতে নিয়োগ করার পূর্বে একথা যেন একবার ভেবে দেখি।

এত কথা বলবার কারণ যে সম্পূর্ণ রূপে ঘটেচে এমন উক্তি আমি করচি না। বাংলা সাহিত্য আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েচে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য-রসিকগণ বাংলা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেচেন এবং মূল বা অনুবাদের সাহায্যে তাঁরা রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় স্থাপন করতে ব্যগ্র এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য। সেজন্যেই আমাদের অবহিত হতে হবে যেন আমরা সাময়িক উত্তেজনার মোহে পথভ্রান্ত হয়ে না পড়ি। ভারতীয় আদর্শ অম্লান রাখবার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে—এ কথা আমরা যেন না ভুলি। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে যেন পথ দেখে নিয়ে চলি সত্য ও সুন্দরের পেছনে, সাময়িক হুজুক থেকে নিজেদের যেন যথাসম্ভব দূরে রেখে চলি। দেশপ্রেমের এ আর এক দিকের বিকাশ, স্পষ্ট কণ্ঠে এ কথা প্রচার করতে যেন লজ্জিত না হই।

আবার রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতে হয়। সাহিত্যে কতবড় আদর্শ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে রেখে গেলেন। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা করচি ঘরে ঘরে, কিন্তু রসক্ষেত্রে বা শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর পূজা ওভাবে হবে না। হবে যখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোকবর্তিকা হস্তে শ্রেয়ের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হব। সে যে কতবড় সম্পদ, সে যে কতবড় আদর্শ তার সম্যক মাপকাঠি এখনও আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তাকেও অনেকটা আমরা হুজুকের পর্যায়ে এনে ফেলেচি।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের গর্ব করবার জিনিস রয়েচে। নবতর বাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েচে। সেই আশার বাণীটি উচ্চারণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেচি বঙ্গবাণীর বেদিমূলে কয়েকজন শক্তিধর নবীন লেখকের আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হলো যে বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব, যেমন ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল 'নব বাবু বিলাসের' ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন সেদিনও দেখেছি বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। এঁরা নব্য-বাংলার প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েচেন। সে সুর বেজে উঠেচে এঁদের লেখায়। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন সে মাটি অজর অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করচে।

আর একটি কথা সকলের শেষে বলি।

সাহিত্য আমাদের মনকে অমৃতরস দ্বারা বলবান করচে। তা যে কোনো আঙ্গিকের মধ্য দিয়েই হোক না কেন। নিগূঢ় বিশ্ব-রহস্যের অন্তরতম বস্তুটির সন্ধানে যে আনন্দ, যে আনন্দ তার আবিষ্কারে—উপনিষদে ঋষির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মন্ত্রে তার রূপ আমরা দেখেছি। সুতরাং এও সাহিত্যের যে একটা বড় দিক তা আমাদের মনে রাখা উচিত। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করচে জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে দেবে আমাদের উদার, মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি; সকল সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তিআমাদের পরিচিত করবে সেই অবকাশ ও তৃপ্তির সঙ্গে।

"তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতমমূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে—দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর অনুভূতি ও ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয়। জীবনের দুঃখ, পরাজয় ও ব্যর্থতার দিনে যে সাহিত্যরসিক পাঠক অচঞ্চল থাকেন, দারিদ্র্যের মধ্যেও যিনি নিজেকে হেয়

জ্ঞান না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁর সার্থক। জীবন-সমস্যাগুলির সমাধানের গূঢ় প্রেরণা যে সাহিত্যে তার মধ্যে আমরা পাব কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্তিটির সন্ধান।

আর্টের পুরোনো রস-চক্রে যদি আমরা এখনও ঘুরপাক খেয়ে মরি, তবে রবীন্দ্রনাথের মত বড় আদর্শের উপযুক্ত মূল্য আমরা দিতে পারবো না। বস্তুনিষ্ঠার নামে বা ছদ্মবেশে যাঁরা সাহিত্যের আদর্শকে ইদানীং বিভ্রান্ত করে তুলেচেন, আমাদের দেশের সত্যিকার সমস্যাকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে যাঁরা সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন তাঁরা যেন এসব কথা একবার ভেবে দেখেন। যে সাহিত্যের শিকড় এ দেশের মাটি থেকে রস সঞ্চয় করচে না, সমাজের বা দেশের মনে সে ধরনের সাহিত্যের কোনো ফলপ্রসূ আবেদন থাকতে পারে না। এরূপ উৎকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠার স্বৈরাচার থেকে বঙ্গভারতীকে তাঁরা যেন মুক্তি দেন, এই আমার একান্ত কামনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প

মানব-জীবনের দৈনন্দিন অতি-পরিচিত ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশের যে অংশকে অবলম্বন করে সাহিত্য বড় হবার চেষ্টা করেচে সে অংশটা তাকে বিশেষভাবে পুষ্ট করে তুলেচে উপন্যাস ও গল্পের দিক থেকে। তাই সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন সত্যিকারের ঘটেচে উপন্যাস ও গল্পের সাহায্যে। গল্পের কাজটা আবার একটু বেশি কৃতিত্বের। এই হিসেবে যে গল্প সে রকম পরিবেশকে সাহিত্যের কাছে পৌঁছে দিয়েচে খুব সহজে ও ছোট করে। সাহিত্যে গল্পের মান সে জন্যে খুবই উঁচুতে। সাহিত্য যেদিন থেকে জন্ম নিয়েচে সেদিন থেকেই প্রায় ছোট গল্প আত্মপ্রকাশ করেচে তাকে উন্নত করে রাখতে নিজের দিক থেকে। কিন্তু তার পরিচয় আমাদের কাছে খুব বেশি দিনের নয়। ছোট গল্পকে আমরা চিনেচি বিশেষ করে মোপাসাঁর দৌলতে, তাও সেটা বিদেশী সাহিত্য। তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখতে শিখেচি বিদেশী সাহিত্যে গল্পের মান-মর্যাদা যার অনুকরণে আবার বাংলা সাহিত্যে গল্পের স্থান দিতে শিখেচি যথেষ্ট খাতিরের।

বাংলা সাহিত্যে গল্পের যে ধারা এখন পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে মৌলিকত্বপাওয়া যায় না বিশেষ। সবই যেন কতকগুলো শেখানো বুলি আওড়ানো, বেশি রকম বিদেশী ঘেঁষা, আর যেন কোনো 'ইজমে'র চাপে পড়া। যা হোক, নরনারীর প্রেমের কাহিনী নিয়ে যে একটানা একটা একঘেয়েমি পেয়ে বসেছিল গত শতাব্দীর বাংলা গল্পে সেটার থেকে মুক্তি দিতে যে সংস্কারসাধনের চেষ্টা হতে চলেচে আজকের গল্পে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই সংস্কার সাধনের ব্যাপারটা এতই দ্রুত ও সামঞ্জস্যবিহীন ভাবে হয়ে চলেচে যে মৌলিকতা বলে জিনিসটা নষ্ট হতে চলেচে, যে মৌলিকতার গৌরবে বাংলা সাহিত্য এতদিন শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষ অধিকার করে ছিল। মোহিতলাল প্রমুখ বিশিষ্ট সমালোচকরা বলেন, আজ সেই মৌলিকতার অভাবেই বাংলা সাহিত্যে গঠনমূলক বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সংস্কারের ছদ্মবেশে সমালোচনাই স্থান নিচ্ছে বেশি করে। সংস্কারসাধন মানে মৌলিকত্ব বিনাশ নয়। সংস্কার করতে হলে মৌলিকত্ব বজায় রেখেই সেটা করতে হবে। আর এই মৌলিকত্ব আমাদের সাহিত্যে এসেচে আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে, রবীন্দ্রনাথের যুগ এসেচে বঙ্কিমের যুগ থেকে যেটা এসেচে বিদ্যাসাগরের আমল থেকে। তাই 'গল্পগুচ্ছে'র'গল্পভারতী'র যুগে নাম করা হচ্ছে 'কথামালা', 'মণিমঞ্জুষার'। কথামালার যুগও সন্ধান নিয়ে গেছে 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রে'র যুগের। সুতরাং মৌলিকত্বের খোঁজ পড়লে প্রাচীনের দিকেও দৃষ্টি যায় ক্ষেত্রবিশেষে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যেরও দাম আছে—এ হিসাবে যতই তার ভাষাকে 'ডেড ল্যাঙ্গোয়েজ' বলে মেরে রাখা যাক না।

সংস্কৃত সাহিত্য ঐশ্বর্যশালী হয়েছে প্রধানত নাটকের জন্যে। সংস্কৃত নাটকের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গদ্য আর পদ্যের অপূর্ব সমাবেশ। শব্দ-অলঙ্কার পূর্ণ গদ্যের সঙ্গে কাব্যমাখা ছন্দগাথা শ্লোকের প্রযোজনা তাকে দিয়েচে একটা স্বকীয় ভঙ্গিমা যার দরদে সংস্কৃত নাটক আমাদের কাছে আজও এতটা প্রিয়। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, নাটকের সাধারণ অধিকাংশ সংলাপ লেখা হয়েছে প্রাকৃত ভাষায়—যে ভাষা প্রাথমিক কাব্যরূপ নেয় নানা রকম আখ্যান ও গল্পের ভিতর দিয়ে। 'কাদম্বরী' প্রমুখ ক'টা বিখ্যাত নাটক কাব্যের রূপে প্রকটিত হতে দেখা গেছে সহজ ও লোকপ্রিয় একরকম গল্প যার প্রভাবেই নাট্যে সংলাপের মাধুর্য। তাছাড়া নাটকের বিষয়বস্তু

গঠনে যথেষ্ট প্রভাব পাওয়া গেছে প্রাচীন জনপ্রিয় গল্পগুলোর, যাদের স্রষ্টা ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী। নাটক ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য গদ্য রচনাতেও এ রকম প্রভাব দেখা গেছে প্রাচীন লোকশ্রুত নানা রকম গল্পের।

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পের গোড়ার দিকে আমরা দেখি তিন রকম রূপ-এর। এক রকম হচ্ছে জাতীয় গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে বীরত্বের কাহিনী যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'লিজেন্ড' (Legend)। আর এক রকম হচ্ছে নীতি-শিক্ষার উদ্দেশ্যে উপমা ও তুলনামূলক সহজ গল্প যার ইংরিজি পরিচয় 'ফেবল' (fable)। তৃতীয়টা হলো সহজ ও সাধারণ উদ্দেশ্যবিহীন আমোদদায়ক গল্প যাকে ইংরিজিতে বলে 'টেল' (tale)। দুঃখের বিষয় সংস্কৃতে এই তিন রকম গল্পের স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবেএদের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাই বিখ্যাত গল্পগুলোতে।

প্রথম রকমের গল্পগুলোর মধ্যে বলা যেতে পারে সেগুলোকে, যেগুলো পাওয়া যায় 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে'। বৃহৎ কথামঞ্জরী প্রকাশিত হয়েছিল ১০৬৬ থেকে ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। রচনা করেছিলেন তখনকার কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র। কাশ্মীরের প্রাচীন জনশ্রুত কাহিনীগুলোকে সুন্দরভাবে গল্পের আকারে সাজিয়ে গ্রন্থরূপ দেওয়ায় ক্ষেমেন্দ্রের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। সরল প্রাকৃত ভাষার সরস রচনার একটা ভঙ্গি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর একটা বড় দান। 'কথাসরিৎসাগর'এর রচয়িতা সোমদেব। রচিত হয়েছিল 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' রচনার প্রায় পঁচিশ বছর পরে। পর পর আঠারোটি লম্ভকে একশ' চব্বিশটি ভাগে ভাগ করে একটা মনোরম গল্পধারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এর নাম কথার স্রোত সাগর। গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে রাজা উদয়নের পদ্মাবতী হরণের কাহিনী খুবই সুখপাঠ্য। পঞ্চম ভাগ চতুর্দারিকায় সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে রাজপুত্র শক্তিভোগের বিজয়াভিযান ও রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে প্রবেশ করে চারজন সুন্দরী যুবতীকে হরণ। এখানে বিন্ধ্য পর্বতের প্রাকৃতিক বর্ণনা সত্যি উপভোগ্য। ষষ্ঠ ভাগে আছে বীর নরবাহন দত্তের সিংহাসন লাভের আগের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। এ রকম অন্যান্য ভাগেও আছে বিভিন্ন রকমের কাহিনীর সুন্দর বর্ণনা। 'কথাসরিৎসাগর'-এর বৈশিষ্ট্য রয়েছে মূল গল্পের সঙ্গে বহু সংখ্যক অন্য বিভিন্ন রকমের ছোট গল্পের সুচতুর সংযোজন। গল্পগুলোর দাম শুধু সরল বর্ণনাভঙ্গি ও দুরূহ ভাবপ্রবণতা অর্জনের চেষ্টায় যার জন্যে সেগুলো এতটা প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী। তবে এর দোষ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকৃতির কাহিনীর প্রাচুর্যে অনেক সময় মূল কাহিনীকে হারিয়ে ফেলতে হয়। বুদ্ধস্বামী-রচিত 'শ্লোক-সংগ্রহ'ও একই শ্রেণীভুক্ত একটা উঁচুদরের গল্পগ্রন্থ। রচনা হয়েছিল নবম শতাব্দীতে নেপালে। এতে আছে আটাশটি অধ্যায়ে চার হাজার পাঁচশ' চব্বিশটি শ্লোক। প্রাচীন জাতীয় বীরগাথা লেখা হয়েছিল এতে সরল সংস্কৃত ভাষায়। বুদ্ধস্বামীর রচনার বিশেষত্ব হচ্ছে অলঙ্কার-বর্জিত সরল শ্লোক প্রয়োগে সম্পূর্ণ কাব্যভাব ফুটিয়ে তোলা। সংক্ষিপ্ত ক'টা উপমাদির সাহায্যে একটা বিরাট ভাব ব্যক্ত করার অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা পাই তাঁর গ্রন্থে।

শিক্ষামূলক নীতিযুক্ত গল্পগুলো অর্জন করেছে আরও বেশি লোকপ্রিয়তা। কারণ এগুলো রচনার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে গল্পের ছলে সৎপথে চালিত করা। প্রত্যেক গল্পকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে সহজ ভাবে উপমা ইত্যাদির সাহায্যে সুবোধ্য করা হয়েছিল। গল্পের শেষে প্রযুক্ত হত একটা নীতিকথা পাঠকদের মনে গল্পের বিষয়বস্তু ও তার শিক্ষণীয় বিষয় গ্রথিত করে রাখতে। এ রকম গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ, জীবজন্তুর চরিত্রাঙ্কণে তাদের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে গল্পাংশ সৃষ্টি করা। এদিক থেকে গল্পগুলো একটা অভিনবত্ব দিয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। জীবজন্তুর চরিত্র অবলম্বনে সুন্দর ছোট গল্প রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের একটা স্বীয় বৈশিষ্ট্য। যেটা ইংরিজি সাহিত্যে একটু পাওয়া গেছে ঈশপের 'ফেবল'স-এর মত গল্পগুলোতে। সংস্কৃত গল্পগুলোতেআবার প্রযুজ্য হয়েছে ছোট ছোট শ্লোক, যেগুলোর লোকপ্রিয়তা আজও হারায়নি, দৈনন্দিন জীবনযাপনে পথপ্রদর্শকের কাজ করে আসছে। জীবজন্তুর চরিত্র সৃষ্টি করে নীতিগত গল্প রচনার একটা কারণ আমরা পাই সমালোচকদের কাছে। গল্পগুলো রচনার যুগে ভারতবাসী প্রধানত বাস করত মুক্ত গ্রাম্য আবহাওয়ায়। তাই তাদের জীবন ও চরিত্র গঠনে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দান ছিল অনেকটা। একই প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় পুষ্ট নানা শ্রেণীর জীবও মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছিল ও অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহচরও হয়ে

পড়েছিল—যা আমরা আজও দেখি কুকুর, বেড়াল, গরু, ঘোড়া ও নানা রকম পাখি পোষার প্রবৃত্তিতে। মানুষের এই রকম জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়েছিল তখনকার সাহিত্যে ও কাব্যে। ঋকবেদেও আমরা পেয়েছি বর্ষারম্ভে ভেকের ডাক ঘোষণা করত ব্রাহ্মণদের পূজা উপাসনার সময়। উপনিষদেও আছে কুকুরের 'উদ্‌গীত' যা নির্দেশ দিত নাকি ঋষিদের তপ-জপের। তাছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রেও জীবজন্তুর চরিত্রের উপমার সাহায্য নেওয়া হত কুটনীতি সহজভাবে বুঝতে। সোনার বিষ্ঠাত্যাগী পাখির গল্পের সাহায্যে বিদুরকে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতে পাণ্ডবদের বিষয়ে। বৌদ্ধ-জাতকেও পাওয়া যায় পশু-পাখিদের গল্পের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধধর্মের সহজ আলোচনা করতে। এই রকম যে সব নীতিগল্প অমরতা পেয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা''হিতোপদেশ'।'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' বা 'পঞ্চতন্ত্র' রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজদরবারের ভাষা বলে পরিচিত হয়েছিল। এর রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা। মহিলারোপ্যের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা যে পাঁচটি তন্ত্র রচনা করেছিলেন তাই পঞ্চতন্ত্র নামে খ্যাত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজকার্য চালনার নীতি ও উপায়গুলো সহজভাবে গল্পের মধ্যে দিয়ে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল পঞ্চতন্ত্র। রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যেও আবার দেখা যায় মতদ্বৈধ। একদল বলেন, রচনার গোড়ায় যার প্রভাব ছিল সেটা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব তিনশ' অব্দের আগে কাশ্মীরী ভাষায় লিখিত 'তন্ত্রাখ্যায়িকানামে গ্রন্থটি। আর এক দলের মতে এতে খানিকটা প্রভাব পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের'।'তন্ত্রাখ্যায়িকা' পাঁচটা ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে করটক ও দমনক নামে দুই শৃগাল, একটি সিংহ ও ষাঁড়ের মধ্যে যে বৈরিতা এনে দিয়েছিল তা দেখানো হয়েছে বেশ যুক্তির অবতারণা করে। দ্বিতীয় ভাগে আছে পাঁচটা মজার গল্প—যাদেরচরিত্রগুলো হচ্ছে ঘুঘু, কাক, পেঁচা, ইঁদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি। জীবজন্তুর চরিত্র অঙ্কন ও তাদের কথোপকথন প্রয়োগের কুশলতাই লেখকের বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শৃগাল কর্তৃক পশুরাজ সিংহকে কূপে নিক্ষেপাদি নীতিগত গল্পগুলোর জন্যে এর দাম আজও আছে। এ সব ছাড়াও মহাত্মা শিবির দেহদানের গল্পের মত শিক্ষণীয় গল্পও আছে অনেক। তাছাড়া প্যাঁজ চোরের প্যাঁজ খেয়ে শাস্তি পাওয়া, বোকা অপরিণামদর্শী ব্রাহ্মণের আকাশকুসুম কল্পনার শোচনীয় পরিণামের মত গল্পগুলোর মধ্যে লেখকের রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো প্রধানত 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'থেকেনেওয়া। বিষ্ণুশর্মার কৃতিত্ব শুধু বৃহৎ আকারের গ্রন্থকে কৌশলে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে মৌলিকতা বজায় রেখে একটা শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষমতায়। সরল গদ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছোট শ্লোকের প্রয়োগে সংস্কৃত গল্প রচনায় এ একটা বিশেষত্ব আরোপ করেছে। শ্লোকগুলোর উৎস হচ্ছে প্রধানতঃ সংস্কৃত মহাভারত ও পালি ভাষায় রচিত জাতকের শ্লোক। গল্পাংশে এদের নিষ্ঠুর প্রয়োগে গল্পের বর্ণনাকে একটা মাধুর্য দেওয়াই এদের বড় কাজ। এটুকুর জন্যেই বিশেষ করে পঞ্চতন্ত্রের লোকপ্রিয়তা আজও।সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে তাই এ ইংরেজ টিপ্পনীকারদের কাছে 'textus simplicior'বলে পরিচয় পেয়েছে। 'হিতোপদেশের' খ্যাতি পঞ্চতন্ত্রের পাশেই। 'হিতোপদেশ' আলাদা কোনো বিষয়ের গ্রন্থ নয়। পঞ্চতন্ত্রকেই পরিবর্তিত করে নতুন আকারে নতুন ভঙ্গিতে সাজাবার একটা চেষ্টা হয়েচে এতে। এর গল্পগুলো পঞ্চতন্ত্রেরই মত পেয়েচে জনপ্রিয়তা। হিতোপদেশ রচনা করেন নারায়ণ তখনকার একজন বাংলাদেশের বড় পণ্ডিত ধবলচন্দ্রের সাহায্যে। তাই তখন এর খ্যাতি বাংলাদেশেই ছিল বেশি।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের জনপ্রিয়তা শুধু প্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিস্তৃত প্রচার এদের লোকপ্রিয়তাকে নিয়ে গেছে সুদূর প্রতীচ্যেও। মূল সংস্কৃত থেকে 'পঞ্চতন্ত্র' অনুদিত হয়েছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া ও আরবি ভাষায়। অনেক পরে ১২৫২ সালে অনুবাদ করেছিলেন স্পেনের কোন পণ্ডিত। তার পর একে অনুবাদ করা হয় হিব্রু ভাষায়। হিব্রু থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন ক্যার্পুয়ার জন সাহেব যার অনুবাদ আমরা পাই ইটালী ভাষায় ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে। তারই প্রথমভাগটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস নর্থ। এইভাবে অষ্টম থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র। ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে ঈশপ প্রভৃতি সাহেবরা 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' থেকে অনেকটা ধার করেছে গল্প, ভঙ্গি ও

চরিত্র সৃষ্টিতে। কবি কিপলিং-এর 'Jungle Book'নামে বিখ্যাত গল্পগ্রন্থে জীবজন্তুর চরিত্রাঙ্কণ ও কথাবার্তায় পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব অনেকটা লক্ষ্য করা যায়।

'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশে'র মত নীতিমূলক গল্পগ্রন্থ ছাড়াও আরও অনেক গল্পগ্রন্থ আছে, যেগুলোর দাম আছে যথেষ্ট আনন্দদায়ক সুখপাঠ্য হিসেবে। তাদের রচনার উদ্দেশ্য কোনোরকম নীতির অবতারণা লোকশিক্ষা দেওয়া নয়। তাদের গল্প শুধু গল্পেরই খাতিরে। তাদের লক্ষ্য কেবল গল্প ও রস রচনার ভিতর দিয়ে পাঠকের মনকে আমোদ দেওয়া। সাহিত্যিক বিচারে তাদের দাম চরিত্রসৃষ্টি, অলঙ্কার-বৈচিত্র্য, শ্লোক-পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বিচক্ষণতায়। এই শ্রেণীর গল্পগুলোকে ইংরেজি tale বলে পরিচিত করলেই বোঝা যাবে স্পষ্ট। এ রকম গল্পগ্রন্থ হিসেবে 'বৃহৎকথা' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতিকা' শ্রেষ্ঠ স্থান নেয়।'বৃহৎকথা' রচনা করেন মহাপণ্ডিত গুণাঢ্য পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে। 'বৃহৎকথা'য় গুণাঢ্য অধিকাংশেই ব্যবহার করেন পৈশাচি ভাষা। পৈশাচি ছিল তখন বিন্ধ্য পর্বতের পার্বত্য জাতিদের জাতীয় ভাষা। এ ভাষা প্রয়োগে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় এর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা সংমিশ্রণে, যার থেকেসংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধটা পাওয়া যায় খুব কাছাকাছি। এর প্রভাব খানিকটা পাওয়া যায় কালিদাসের বিখ্যাত নাটকগুলোতে প্রাকৃত সংলাপ প্রয়োগে। বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে গল্পাংশকে পুষ্ট করে তোলার অদ্ভুত এক ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় 'বৃহৎকথায়' যার জন্যে গুণাঢ্য সংস্কৃত সাহিত্যে আজও অমর। মূল গল্পাংশে অনেকটা দেখা যায় রামায়ণের প্রভাব। রাজা নরবাহন দত্তের বীরত্বজীবন নিয়েই এর বিষয়বস্তু। নরবাহন দত্ত প্রথমে বেগবতী পরে গোমুখের সঙ্গে দীর্ঘ প্রবাসে যাত্রা করে হাজির হন এসে বিদ্যাধরের রাজ্যে। সেখানে তিনি রাজকুমারী মদনমঞ্জুকাকে বিবাহ করেন। সে সময়ে মদনমঞ্জুকার রূপে আকৃষ্ট হয়ে দুষ্টচরিত্র মানসবেগ রাজার শত্রুতা অর্জন করে, যেমন রামায়ণে দেখা যায় রাবণ আকৃষ্ট হন সীতার প্রতি। সীতার মতই মদনমঞ্জুকাকে লেখক দেখিয়েছেন সতীসাধ্বী করে। রাজা নরবাহন দত্তের বিবাহোত্তর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জীবন অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। মদনমঞ্জুকার চরিত্রেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্পষ্ট করে দেখানো হয়েচে। তাই কজন টিপ্পনীকার মন্তব্য করেচেন 'বৃহৎকথা'য় গুণাঢ্য বৌদ্ধধর্মই প্রচার করেচেন বেশি করে। কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে তাঁদের এ মন্তব্য দাঁড়ায় না। কারণ গ্রন্থটাতে বর্ণনাভঙ্গি, চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপপ্রয়োগ, শ্লোকসংযোজন এগুলোর মধ্যে দেখা যায় এমন এক বিশিষ্টতা যার জন্যে এ পাঠকমনে একটা গভীর ছাপ রাখতে পারে চিত্তামোদী সুখপাঠ্য গল্প হিসেবে। গল্পের স্বচ্ছ গতির সঙ্গে এক একটা চরিত্রকে খাপ খাইয়ে তাকে স্পষ্টতর করে পাঠকের মন অধিকার করতে একটা অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় আমরা পাই গুণাঢ্যের মধ্যে। পরবর্তী কালের নাট্যকাররাও তাঁর কাছে মনে হয় এবিষয়ে যথেষ্ট ঋণী। 'বৃহৎকথা'র নরবাহন দত্ত, গোমুখ, মদনমঞ্জুকার মতন চরিত্রগুলো সংস্কৃত সাহিত্যে হয়ে থাকবে অমর।

আমোদদায়ক গল্প হিসেবে 'বৃহৎকথা'র পরই আসে 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা'। 'বৃহৎকথা' রচিত হয়েছিল গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা' রচিত হয়েছিল প্রধানত সরল গদ্যে। তবে এতে শ্লোক যে নেই একেবারে তা নয়, যা আছে তা খুবই কম আর গুণে 'বৃহৎকথা'র শ্লোকগুলোর তুলনায় নিকৃষ্ট। লেখকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে শিবদাস যে লেখক ছিলেন তা পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েচেন। গল্পগুলো রচিত হয়েছিল সরল সংস্কৃত ভাষায়। পঁচিশটি গল্প পর্যায়ক্রমে এমনভাবে সাজানো হয়েচে যে প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র পাঠককে খুঁজে বার করতে হয় না কষ্ট করে। গল্পের শেষে একটা অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা ভাব পাঠককে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এই অনুসন্ধিৎসা ভাব সৃষ্টি করার মুন্সিয়ানাতেই লেখকের কৃতিত্ব। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শ্মশানে মৃতদেহ আনতে গিয়ে প্রেতাত্মার অদ্ভুত গল্পের অবতারণায় তাঁকে বিব্রত করার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী নিয়েই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র রচনা। কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক ও আবালবৃদ্ধবনিতা সব পাঠকের প্রিয় পাঠ্য।

এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'শুকসপ্ততি' নামে আর এক গল্পগ্রন্থের।'শুকসপ্ততি'র রচয়িতা ও রচনাকাল অজ্ঞাত। একটা শুক পাখির মুখে সত্তরটা চিত্তাকর্ষক গল্প এর বিষয়বস্তু। রচনায় অনেকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকার'। বিশেষত্ব এই যে সত্তরটা গল্প এমনভাবে পর পর রচিত হয়েছে যে পাঠকের ধৈর্য কখনও ভেঙে যায় না বরং গল্পের পরবর্তী অবস্থা জানবার জন্যে জাগিয়ে রাখে একটা আগ্রহ।

সহজ সংস্কৃত ভাষায় গল্পের পর গল্প সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে বিশেষ বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি লেখকের বিশেষত্ব।

গল্পের দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় ততটা উন্নত না হলেও সংখ্যাল্পতার ভিতরেই পাওয়া যায় যথেষ্ট গুরুত্ব যেটাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের মত, 'এর যা আছে তা এরই'। তাই এর স্বাতন্ত্র। গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য শুধু উপমা, অলঙ্কার, শ্লোক, চাতুর্য ও বর্ণনার স্বাভাবিক সরলতার মধ্যে। এতে একদিক থেকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে গভীর পাণ্ডিত্য অন্য দিকে তেমনি পরিচয় পাওয়া গেছে গল্পগুলোর জনপ্রিয়তার। বিষয়বস্তুর ভিতর জটিলতা, তত্ত্বালোচনামূলক কিছু দেখা যায় না। তাই সব শ্রেণীর পাঠকদের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। গল্পগুলোতে বিষয়বস্তুর সরলতার সঙ্গে তুলনামূলক চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা গল্পাংশকে একটা সুষ্ঠু গতি দেওয়ার জন্যে সংস্কৃত গল্পের স্থান অনেকটা উঁচুতে। গল্পবর্ণিত চরিত্রগুলো তাই এতটা পরিচিত আমাদের কাছে, যাদের উদাহরণ আজও আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে যথেষ্ট কাজের। এখানেই সংস্কৃত গল্পের জনপ্রিয়তা।

সাহিত্য ও সমাজ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলাবৃন্দ ও বন্ধুগণ—প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে সমগ্র উত্তর ভারতের বাঙালী সমাজের সাহিত্যিক প্রতিনিধি। আমার সৌভাগ্য যে, আজ বাংলা দেশ থেকে এই সুদূর মীরাটে এসে সেই সম্মেলনের উৎসব স্বচক্ষে দেখবার সুযোগলাভ করেছি।

আপনাদের সম্মেলনে (বঙ্গ-সাহিত্য শাখার) পৌরোহিত্য করতে আহ্বান করে আমাকে আপনারা যে সম্মান দান করেচেন, সেজন্য সর্ব প্রথমেই আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এই সম্মেলনে যোগদান করার একটি অন্তর্নিহিত তাগিদ আমার আছে; কারণ লেখকের প্রথম প্রয়োজন বৃহত্তর সমাজ ও গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসা। আপনারা এ সুযোগ দান করেচেন আমাদের, বাংলার সাহিত্যসেবিগণ সকলেই এর উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সুসংবাদ, এ সাহিত্য ক্রমশ সমাজ-চেতনায় মুখর হয়ে উঠচে। গত মন্বন্তরের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে এই লক্ষণটি অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে আরও বেশি করে। তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণ এ সম্বন্ধে পথপ্রদর্শক। তাঁদের বৈশিষ্ট্য একদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথক অধ্যায় সৃষ্টি করবে। এই সমাজচেতনা ব্যক্তিবোধের সঙ্গে বিরোধিতা করেনি, বরং তাকে আরও বাস্তব ও আরও সক্রিয় করে তুলতে চেয়েচে। সেই সমাজবোধ অনিষ্টকর যা কিনা মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপনের দাবী নিয়ে ব্যক্তিবোধকে ক্ষুণ্ণকরে। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কথা এই ব্যক্তিবোধ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। মানুষ নিয়ে ইতিহাস, মানুষ নিয়েই সাহিত্য। আশা ও নিরাশার অনুভূতিতে সদাচঞ্চল কতকগুলি মানুষ নিয়েই যেমন সমাজ, তাদের প্রত্যেকের অনুভূতির চরিতার্থতা দিয়েই সমাজবোধের সার্থকতা। চরিতার্থ ব্যক্তিবোধের সমষ্টিতেই সার্থক সমাজ গড়ে ওঠে। অতএব ব্যক্তিবোধ সাহিত্যে অবান্তর নয়, মূল উপাদান। মানুষ আকাশে বাস করে না, সমাজে বাস করে; তাই নভোচারী সাহিত্য তাকে স্বপ্নালু করে তুলতে পারে, জীবনযাপনের সমস্যাসমূহের সমাধানের সাহায্য করতে পারে না।

বাংলাদেশ যখন এত বড় মন্বন্তরের সম্মুখীন হোল, বাংলার রসস্রষ্টা সাহিত্যিকদের মনে তা যথেষ্ট বেদনা ও আবেগের সৃষ্টি করে গেল। তাঁরা প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখার সুযোগ পেলেন। কল্পনার রসবিলাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা আজ নিতান্ত অসার বলে পরিগণিত হবে জাতির উগ্র বেদনাবোধের সম্মুখে। জাতিকে তা সাহায্য করবে না। পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না। দেশকে জাগাতে হবে। মন্বন্তরের করাল ধ্বংসলীলার মধ্যেও বহু নরনারীকে দিব্যআরামে সোনার পালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে মোটরচারী বিলাস-ব্যসনের পক্ষে নিমজ্জিত থাকতে দেখে তাঁরা বুঝলেন, দেশ সজাগ হয়নি। তাঁরা ঘুম ভাঙানোর ভার নিয়েছিলেন। প্রবোধের

'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি সেই ঘুম ভাঙানোর গান। ঘুম ভাঙলো কিনা জানি না, কিন্তুলজ্জিত হোল অনেকে।

আজও অনেকে অভিযোগ করেন, বাংলা সাহিত্যে এখনও সমাজবোধ, রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রভৃতি অঙ্কুর অবস্থায় মাটি থেকে উঁকি মারচে মাত্র। এত বড় আগস্ট আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন এতটুকু দোলা দেয়নি কথাসাহিত্যিকদের মনে। কোথায় এই বিপ্লবের সাহিত্য, যা দেশকে বল দেবে, দেশবাসীর মনে আশা ও উৎসাহ আনবে, পথ দেখিয়ে দেবে। দু-একজন উন্নাসিক সমালোচক এ নিয়ে সাময়িক পত্রে শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হন নি, বাংলা সাহিত্যিকদের অক্ষমতার ইঙ্গিতও করেচেন।

বাংলার সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার আবশ্যক নেই। লেখা আসে কবিমানসের অন্তর্নিহিত তাগিদ থেকে। কবিমানসের বিভিন্নমুখী গতি থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখার সৃষ্টি। যেদিন বাংলার লেখকরা দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন, সেই প্রসারিত চেতনাই তাদের বাধ্য করবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সমাজসমস্যাকে আশ্রয় করে গল্প ও উপন্যাস লিখতে। এই ব্যাপক চেতনার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেচে বহু শক্তিশালী লেখকের সাম্প্রতিক রচনায়। আমরা পেয়েছি দুর্ভিক্ষ, পেয়েছি আগস্ট আন্দোলন। একটি জীবন্ত সাহিত্য বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় করে রেখে দিচ্চে। বহু লেখার আবশ্যক কি? একখানি সার্থক রচনায় এক এক যুগকে অমর করে রাখে, যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার দুঃখদুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেচে ওয়েলেস্কির 'দি রেনবো' নামক উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে ভারতব্যাপী বিরাট রাষ্ট্র আন্দোলনের চিত্রকে অমর করে রেখে গেলেন। এঁদের প্রতিভা ঐ সব রচনাকে অপূর্ব আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে যুগ প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উন্নত করে দিয়েচে। গণ-চেতনা যে কিভাবে অমর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার খোঁজ নিতে গেলে ওগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের মাপকাঠি হচ্চে তার রসোত্তীর্ণতা। যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে জীর্ণ পুঁথির পাতার মত অবহেলিত হয় যে রচনা, মানব-মনের প্রয়োজন-সাম্য যা বজায় রাখতে পারে না, তার দুর্গতির কারণই হচ্চে রসোত্তীর্ণতার অভাব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই বিষয়টি রসোত্তীর্ণ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই। নিজের ব্যথাবোধ ও নিপীড়িত চেতনা কবিমানসকে যে রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠে অনুভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আজ যে ব্ল্যাকমার্কেট, যে অসংযত অর্থলোলুপতা, যে বস্ত্রদৈন্য, অন্নকষ্ট দেশব্যাপী হয়ে উঠেচে তাতে নিছক কল্পনাবিলাসের সাহিত্য এখন অসার বলে পরিগণিত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের মধ্যে ফুটে উঠচে নবচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গির নবীনতা, দৃঢ় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট আদর্শ। এসব যে এখনও দানা বাঁধেনি, এ খুব সত্য কথা। নূতন পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য পরিপাক করতে সময় লাগে। সাহিত্য সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের রচনা নয় বা রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয়, মনের থেকে সত্য ও বাস্তব না হয়ে উঠলে লেখকের হাত দিয়ে যে রচনা বেরোয়, তার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না—সুতরাং লোকের হাততালি, বাহবা বা পরামর্শদাতা সমালোচকদের বিজ্ঞ পরামর্শের প্রভাবে বা অতি আধুনিক যুগস্রষ্টা আখ্যায় ভূষিত হবার লোভে বা দুরাশায় যাঁরা এ পথে অগ্রসর হবেন, তাঁরা ঠকবেন। সাংবাদিকদের ধর্ম সাহিত্যিকের পক্ষে পরধর্ম; এটা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই আজও আমরা বাংলা সাহিত্যে আশানুরূপ সন্ধান পাচ্ছি না আধুনিক দিনের উগ্র সমস্যাগুলির। কিন্তু দিকচক্রবালে নব-বাহিনীর অশ্বখুরোত্থিত ধূলি দেখা দিয়েচে, ওদের শঙ্খধ্বনি দূর থেকে আমাদের কর্ণে এসে ধ্বনিত হচ্চে, ওরা আসচে, হতাশার কারণ নেই। বিজ্ঞ সমালোচকদের দীর্ঘশ্বাস এবং 'কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না' ধ্বনির উত্তর এরা দেবে।

আর একটা বড় লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাহিত্যে। আধুনিক বা পাশ্চাত্ত্যের গণ্ডি বাংলার শ্যাম গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েচে, বাংলারবাইরের বহুদেশের পটভূমিকে আশ্রয় করে। বাংলার বেণুকুঞ্জ ও বৃহত্তর বাংলার অরণ্য-পর্বত, মরুদেশ, কঙ্করময় রুক্ষ মালভূমি সবই তার সমান আদরের বস্তু। মানুষের মধ্যে যে লেখক, যে শিল্পী বাস করে, তার কাছে দেশ বা জাতের কোনো সীমানা নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বড় লক্ষণ এই যে, আজ সে উদার মুক্তির ব্যাপ্ত নীলাকাশতলে এসে দাঁড়িয়েচে কি গল্পে, কি উপন্যাসে, কি কবিতায়। এ পথে খনিত্র ধরে আগুয়ান হবেন যাঁরা, তাঁদের কত দল মরুপ্রান্তরে বেঘোরে মারা

যাবেন জানি, কত লোকের পাত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবু তাদেরই কপালের ঘামে পথের ধুলো দেবে ভিজিয়ে, একটা সুনির্দিষ্ট পথরেখা ফুটে উঠবে ওদের গীতিপ্রাণ চরণ-ক্ষেপের ধ্বনির তালে তালে।

এই খনিত্র বাহিনী নতুন সাহিত্য রচনা করেচে, যে কোনো মাসিকপত্র খুঁজে দেখলে এদের গল্প পাওয়া যাবে, কবিতা পাওয়া যাবে, উপন্যাস পাওয়া যাবে। বহু তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে এদের সার্থকতা আসবে একদিন। বহু ব্যর্থতা এদের প্রাণশক্তিকে আরও দৃঢ়, আরও সংহত করে তুলবে। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হয়তো এদের সম্বন্ধে নীরব থাকবে, জয় বিজয়ের ইতিহাসে নাম থাকে সম্রাটদের, সেনাপতিদের, খনিত্র বাহিনীর লোকদের নাম তাতে লেখা থাকে না। তাতে কি? আমরা আজ এদের অভিনন্দন জানাই। এদের ক্রমবিকাশের পারম্পর্য আজ আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়, কারণ আমরা এ যুগের অধিবাসী, এত নিকটে থেকে দেখতে গেলে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্টকে নিছক বাজে আধুনিকতা বলে ভুল করার বিপদ আমাদের পদে পদে। বাংলার উপন্যাস সাহিত্য সত্যিই পেছনে পড়ে আছে অন্য দেশের উপন্যাসের তুলনায়। মননশীল উপন্যাসের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু শুধু ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই, যে ঘটনাপ্রধান উপন্যাস বহু আধুনিক সমালোচকের চক্ষুশূল এবং যে পর্যায়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ফেলতে দ্বিধা করেন না, সেই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বা টলস্টয়ের War and Peace বা ডস্টয়ভস্কির Brother Karamzov-এর মত উপন্যাস কোথায়?

অবশ্য একটা আশার কথা এখানে বলে রাখি বৈদেশিক সাহিত্যেও আদর্শস্থানীয় মননপ্রধান উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গুনে ঠিক করা যায়। গত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ফরাসী লেখক ও সমালোচক জুলিয়ান বেন্দা এই মননপ্রধান কথাশিল্পের ক্ষেত্র তৈরি করেন, তাঁর আন্দোলনকে তখন অনেকে সাময়িক হুজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ এই শ্রেণীর উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্রমশ দেখা দিতে শুরু করেচে। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নামজাদা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাবেক-পন্থী। ওদেশের পাঠকমনেরও গ্রহীষ্ণুতার প্রসারতা যে আমাদের দেশের চেয়ে বেশি নয়, বৃটিশ সাহিত্যের দরবারে জেমস জয়েসের মত খাঁটি মননপ্রধান লেখকের অভ্যর্থনা লক্ষ্য করলেই সেটি অনুমিত হয়।

শরৎচন্দ্রের কিছু পূর্ব থেকে আমাদের সাহিত্যে একটা অস্পষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুরধ্বনিত হচ্ছিল। ব্যষ্টি সমষ্টির মুখ চেয়ে কেন নিজের সুখ-সুবিধার বিসর্জন দেবে এই একটি কঠিন সমস্যামূলক প্রশ্ন ক্রমশ ঠেলে উঠছিল সাহিত্যে—শরৎ-সাহিত্যে সেই ব্যষ্টিকেন্দ্রের সুর অতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এইটিই আসলে শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর। সহৃদয়তা ও মানবতা শরৎ-সাহিত্যের আর একটি সুর।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বইগুলির রচনা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেচে তখন বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলন শুরু হোল, এই আন্দোলনটি অতি উগ্রভাবে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। 'কালি-কলম' ছিল এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দিগের অন্যতম মুখপাত্র। ব্যক্তিত্বের উদ্দাম সাধনাই এই সময়ের বহু গল্প ও কবিতার মূলতত্ত্ব। ঐ একই মূলতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে নানা যৌনসমস্যা বাস্তব বা কাল্পনিক, বিভিন্ন রঙে প্রতিফলিত হয়ে দেখা দিতে লাগলো পাঠকদের সামনে। এই আন্দোলন যথেষ্ট তিরস্কৃত হয়েছিল সে সময়, সে কথা সে যুগের পাঠকের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু সেই নব আলোড়নের সংহত শক্তি বাংলায় একদল নতুন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা তৈরি করেছিল। লেখকদের নব দৃষ্টিভঙ্গি অলক্ষ্যে আশ্রয় করেছিল পাঠকদের। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বড় সুলক্ষণ এই যে, নব আন্দোলনের লেখকরা গ্রহীষ্ণু পাঠকদল সৃষ্টি করেন। যাদের রসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ব যুগের পাঠক সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর। শরৎপূর্ব বা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের উপন্যাস বর্তমানের অতি তরুণ পাঠক-পাঠিকার কাছে জোলো এবং ফিকে ঠেকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবিশ্যি এ পর্যায়ে পড়ে না—তিনি ছিলেন যুগপ্রবর্তক আচার্য, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সাধারণ লেখকদিগের দুরধিগম্য, তাঁর দুঃসাহসিকতা এখনও পর্যন্ত বাঙ্গালার লেখকদের নিকট আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে।

কবি বা শিল্পী মানসের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থেকে রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। এবিষয়ে শিল্পীর স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। অন্তর্নিহিত প্রেরণা ভিন্ন শিল্পী কখনও অগ্রসর হবেন না। বাইরের লোকের তাগিদে বা বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে বা সস্তা হাততালি পাওয়ার লোভে অতি আধুনিক হওয়ার যে চেষ্টা, লেখকের পক্ষে তা মৃত্যুর পথ। এই

কথাটি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত এটি একটি বড় সত্য সাহিত্য ক্ষেত্রে এবং এই সত্যটি না মানার দরুন বহু তরুণ আশাবাদী লেখকের ও লেখিকার ক্ষমতাকে বিপথে গিয়ে নষ্ট হতে দেখেছি। সাহিত্যের চক্ষেও অন্যান্য মত শক্তিকে ও অভিজ্ঞতাকে অর্জন করতে হয় সাধনার দ্বারা। তখন অন্তর্দৃষ্টি আপনিই খুলে যায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অপরের বই পড়ে লাভ করতে হয় না—আপনি এসে আশ্রয় করে শিল্পীকে। এ যেন যোগীর তৃতীয় নয়ন খুলবার মত ব্যাপার। কিন্তু যতক্ষণে সেই দুর্লভ ঘটনা ঘটবে ততক্ষণ শিল্পী যেন কারও প্রশংসার লোভে বা ধমকের ভয়ে স্বধর্ম ত্যাগ না করেন। এতে যদি তাঁর অদৃষ্টে হাততালি না জোটে, নাই জুটবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—আত্মসংজ্ঞাহীন ভীরুচিত্ত শিল্পী নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনেন।

লেখক ও কবির মধ্যে একটি সহজাত নিঃসঙ্গতা আছে। দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন তাঁদের লক্ষ্য, যার জন্যে লেখকের প্রয়োজন আপনার ভাবজগতের মধ্যে যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতম রূপে সম্ভব বাস করা। নিরাসক্ত আনন্দের বা দুঃখের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হন। চারিপাশের মানবহৃদয়ের অন্তরতম স্পন্দনটিকে তিনি প্রকাণ্ড ভাবের অনুভবের চেষ্টা করেন বলেই তো তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মধ্যে বিশ্বমানবের কণ্ঠ বেজে ওঠে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। বাস্তবকে বুঝতে হোলেও দূর থেকে তাকে দেখতে হয় লোকলোচনের অতি স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে যা সব সময় সম্ভব হয় না। এর জন্যে চাই নির্জনতা, খ্রিস্টের চল্লিশ দিনের নিঃসঙ্গ অবকাশ বুঝবার ও বোঝাবার প্রয়াসে তপস্যা। সৃষ্টির আনন্দ আসে যে বিরাট অনুভূতি থেকে—যাকে বলেছেন 'আনন্দ'—"আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে"—সে আনন্দ সহজ প্রাপ্য নয়, সে আনন্দ আপন রস আহরণ করে বিশ্বের তাবৎ সৌন্দর্যরাজির মধ্যে থেকে, পুরাতন সৃষ্টির নব উদ্বোধনের দ্বারপথে তপস্যা ভিন্নসে জগৎ, সে পথ চির অপরিচিতই থেকে যায়। এক শীতের নির্জন অপরাহ্ণে ছন্নছাড়া দরিদ্র সরাইখানা ও সরাইওয়ালীর দুঃখময় জীবন আলফাঁস দোদের মনে যে করুণ অনুভূতি, যে ব্যথা ও বেদনাবোধ জাগিয়েছিল, আমাদের মনেও সেই জীবনের ছবিটি রেখাপাত করে গেল, কারণ লেখকের অনুভূতি তাঁর তপস্যাভূমি সেই সরাইখানার প্রাঙ্গণে একটি শীতের সন্ধ্যায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এযুগেইহোক বা সে যুগেই হোক, নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক লোক সচেতন থাকেন। কবিমানসের রসবোধ থেকে এ চেতনার উৎপত্তি। সর্বপ্রথম তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্যে লেখেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কমবেশী পরিণামে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, কোনো ক্ষণে আদর্শবাদের বা অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, জীবনের ধ্যানে সহসা হয় উন্মনা। রস-সাহিত্যের প্রধান কথা হচ্ছে এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। পাঠকের কথাওঠে তার পরে। সাংসারিক সামাজিক প্রশ্ন ওঠে তার পর।

কিন্তু সহানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী-মানস যুগের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারে না। যে সময়ে যে যুগে তিনি জন্মেছেন তার সার্বিক অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরও। লোকান্তরিত ছবি আঁকবার সাধ্য তাঁর নেই। রাষ্ট্রনীতিক বা সামাজিক অভাববোধ অভিজ্ঞতা তাঁকে সুদৃঢ়ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হতে দেয় না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এক শ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে আশ্রয় করে স্থির পথে অগ্রসর হচ্ছে, যে শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে শ্রেণীচেতনা জড়িত, তাদের মধ্যে লেখনী ধরবার যদি কেউ থাকে, ভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে যাদের জন্ম তাঁদের রচনায় পূর্বোক্ত শ্রেণীর বক্তব্য ফুটে উঠবে কি না তা সার্থক বা পরিপূর্ণ কি না, এসব মূল্যবিচার বর্তমানে করে কোনো লাভ নেই। সময়ের কষ্টিপাথরে এ সবের মূল্য নির্ধারিত হবে একদিন। তবে একটা কথা, দলের হুজুগে বা মতবাদের হুজুগে কেউ যেনএ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করতে না যান। তিনি ঠকবেন।

আত্মসমাহিত শিল্পীমানসের অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে যে সাহিত্য রচিত হয় না, তার মূল্য বড় কম। দুদিনের হাততালির পরে তা নিঃশব্দে যায় মিলিয়ে। এ দায়িত্ব তাঁর নিজের কাছে নিজের, পাঠক গোষ্ঠীকে সচেতন করবার পূর্বে তাঁকে বিচার করে দেখতে হবে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কতদূর সচেতন। তাঁর কবিমানস তৃপ্ত হয়েছে কিনা। আমার নিজের কাছে এ কথাটি সবচেয়ে বড় মনে হয়, যিনি যাই নিয়েই লিখুন না কেন, প্রত্যেক রসসাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। তাঁর নিজের কাছে যা পরিস্ফুট নয়, যা তাঁর কবিমানসকে তৃপ্ত করে

না, জনসাধারণের কাছে প্রশংসা পাওয়ার লোভেই হোক বা সমালোচকের ভয়েই হোক, তেমন সৃষ্টিতে তিনি কখনও হাত দেবেন না। তাঁর মন তখনই সক্রিয় হয়ে উঠবে, যখন তিনি বুঝবেন তাঁর সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে আশ্রয় করে এ লেখা তৈরি। এ কঠিন আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্যে চাই সাহস, যা প্রত্যেক সত্যিকার সাহিত্যিকেরই আছে। নতুবা তিনি লেখক হোতেই পারতেন না। সাহিত্য ও আর্টের মস্তবড় কাজ সমসাময়িক সমস্যার উল্লেখ করা, সমাজসচেতন হওয়া, জনগণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া নবদৃষ্টিভঙ্গির আবাহন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে তাদের অপর উদ্দেশ্য হচ্চে সৌন্দর্য সৃষ্টি, যা সমসাময়িক সমস্যারও অতীত। স্বধর্ম ত্যাগ করা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় আর্টের ক্ষেত্রেও ভয়াবহ।

গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহু বিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিয়েছেন কথাশিল্পী। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে মানুষের হট্টকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে। যে লেখক পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর সত্য চিত্র এঁকেচেন, তিনি সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেচেন।

এত বড় মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে, অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কি ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকেকান্না প্যানপ্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেমনিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রার পালার ট্রাডিশনে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক। অথচ যাঁরা পুরাণ রচয়িতা জনগণকে বাদ দিয়ে তাঁরা চলেন নি। পুরানো দিনের গণমনের কত ব্যথা-বেদনার ইতিহাস ব্যাস-বাল্মীকির অমর মহাকাব্যগুলির মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে—কত গাথা, কত কাহিনী, কত কথা। সে যুগের পটভূমিকায় রচিত কথাশিল্প হচ্চে ওগুলি, সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল কত গাথা, কত কাব্য—রাজসভায় মহাকবি সেগুলির আবৃত্তি করে যেতেন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে।

এইজন্যে পুনরায় বলি সমাজ-সচেতনতা লেখকের মস্তবড় গুণ। যিনি দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য রচনা করেন, তিনি নিজের কবিমানসের প্রতি অবিচার করেন। জীবনবোধের দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না,জনসাধারণের প্রতিঘাতমুখর জীবনধারা থেকে বহুদূরে একটি কল্পলোক সৃষ্টি করেতিনি কল্পনাবিলাস চরিতার্থ করতে পারেন, কিন্তু জীবনের ওপর তাঁর কোনো স্থায়ী ফল ফলে না।

গল্পে ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের হতাশার কারণ নেই, নবতর অশ্ববাহিনীর অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলি দিকচক্রবালে দেখা দিয়েচে, আগেই বলেছি।আর একবার সেই আশার বাণীটি উচ্চারণ করে আমি বক্তব্য শেষ করবো।এই তরুণ লেখকের অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করচি কয়েকজন শক্তিধর নবীন পূজারীর আবির্ভাব। এতে এই প্রমাণ হোল যে, বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব যেমন তা ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল নব বাবু বিলাসের ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন ছিল বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। কলালক্ষ্মীর অর্ঘ্য এঁরা নিপুণহস্তে রচনা করেচেন, এঁরা নব্যবাংলার প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েচেন, এঁদের লেখার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেচে সে প্রাণস্পন্দনের সুর। যে মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সে মাটি অজর অমর। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাব্যতাকে তা নিজের মধ্যে বহন করচে।

আর একটা কথা। সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবে নিগূঢ় বিশ্বরহস্যের সঙ্গে, জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে, দেবে আমাদের উদার, মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি, সকল সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি, আমাদিগকে পরিচিত করবে সেই অবকাশের সঙ্গে—এও সাহিত্যের একটা মস্তবড় দিক। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতম মূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে, দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি। জীবনের দুঃখের দিনে যে সাহিত্যরসিক অচঞ্চল থাকেন, শোকের মধ্যেও যিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন, দারিদ্র্যের মধ্যে যিনি নিজেকে হেয় জ্ঞান করেন না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস রাখেন—সাহিত্য পাঠ তাঁরই সার্থক। সাহিত্য শুধু রসবিলাস নয়,

জীবনসমস্যার সমাধানের গূঢ় ইঙ্গিত থাকবে। যে সাহিত্যের মধ্যে, তাঁরই মধ্যে আমরা পাবো কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্তিটির সন্ধান।

জাতলেখক যিনি, তিনি কখনও নিজের আদর্শ ত্যাগ করে পরধর্মকে আশ্রয় করেন না, একথা ঠিকই। তাঁর শিল্পীমানস যে রচনাদ্বারা তৃপ্তিলাভ করবে না, সে লেখা তিনি কখনও লিখতে পারেন না। সাহিত্যের বিশাল উদারক্ষেত্রে সব শ্রেণীর লেখার স্থান আছে, সব রকম মতবাদের স্থান আছে। অমুক লেবেলে আঁটা সাহিত্যই আসল সাহিত্য, আর সব অপাঙ্‌ক্তেয়—এমন গোঁড়ামি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক। সাহিত্যিকের চাই সেই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সেই উদার সহানুভূতি, যার ফলে জীবনকে অখণ্ডরূপে তিনি বুঝতে ও জানতে পারেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই সহানুভূতিই তাঁর স্থাপন-ক্ষমতার মোড় ফিরিয়ে দেবে। সমাজ, দেশ, রাজনীতি সবকিছুরই রূপ সাহিত্যে ফুটে উঠবার অধিকার আছে, যদি তা রসোত্তীর্ণ হয়। রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি, এ কথা যে কোনো সাহিত্যিক জানেন, যে কোনো শিল্পী জানেন।

পরিশেষে যাঁরা অনুগ্রহ করে আমায় এ সভায় এনে আমার বক্তব্যটি বলবার সুযোগ দিয়েচেন, তাঁদের আর একবার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করচি। বন্দে মাতরম্।[1]

আমার লেখা

আমি কেমন করে লেখক হলাম, এ আমার জীবনের, আমার নিজের কাছেই, একটা অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য হয়তো একথা ঠিক, নিজের জীবনের অতি তুচ্ছতম অভিজ্ঞতাও নিজের কাছে অতি অপূর্ব! তা যদি না হত, তবে জগতে লেখক জাতটারই সৃষ্টি হত না।নিজের অভিজ্ঞতাতে এরা মুগ্ধ হয়ে যায়—আকাশ প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কত কল্পলোক রচনা করেছে যুগে যুগে—তারই তলে কত শত শতাব্দী ধরে মানুষ নানা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের দিন কাটিয়ে চলেছে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বিষাদ, ঋতুর পরিবর্তন, বনপুষ্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব—কত ছোট বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে—কে এসব দেখে, এসব দেখে মুগ্ধ হয়?

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের চোখে কল্পনা সব সময়েই মোহঅঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে। অতি সাধারণ পাখির অতি সাধারণ সুরও তাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে, অস্তদিগন্তের রক্তমেঘস্তূপ স্বপ্ন জাগায়, আবার হয়তো তারা অতি দুঃখে ভেঙে পড়ে। এরাই হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক। এরা জীবনের সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। এক যুগের দুঃখবেদনা আশা আনন্দ অন্য যুগে পৌঁছে দিয়ে যায়।

আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতা তাই চিরদিনই আমার কাছে অভিনব, অমূল্য, দুর্লভ হয়ে রইল। যে ঘটনা আমার জীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে বাঁক ফিরিয়ে দিয়েছে—আমার জীবনে তার মূল্য অনেকখানি।

১৯২২ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ডায়মন্ডহারবার লাইনে একটা পল্লীগ্রামের হাইস্কুলে মাস্টারির চাকুরি নিয়ে গেলুম আষাঢ় মাসে।

বর্ষাকাল, নতুন জায়গায় গিয়েছি। অপরিচিতের মহলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। বৈঠকখানা ঘরের সামনে ছোট্ট একটু ঢাকা বারান্দাতে একলা বসে সামনে সদর রাস্তার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটি ষোল সতের বছর বয়সের ছেলেকে একখানা বই হাতে যেতে দেখে তাকে ডাকলাম কাছে। আমার উদ্দেশ্য, তার হাতে কি বই দেখব এবং যদি সম্ভব হয় পড়বার জন্যে চেয়ে নেব একদিনের জন্যে।

বইখানা দেখেছিলাম, একখানা উপন্যাস। তার কাছে চাইতে সে বললে, এলাইব্রেরির বই, আজ ফেরত দেওয়ার দিন। আপনাকে তো দিতে পারছি নে, তবে লাইব্রেরি থেকে বই বদলে এনে দেব এখন।

—লাইব্রেরি আছে এখানে?

---

[1]অভিভাষণ

—বেশ ভাল লাইব্রেরি, অনেক বই। দু আনা চাঁদা।

—আচ্ছা চাঁদা দেব, আমায় বই এনে দিয়ো।

ছোকরা চলে গেল এবং ফেরবার পথে আমাকে একখানা বই দিয়েও গেল। আমি তাকে বললাম—তোমার নামটি কি হে?

সে বললে—আমার নাম পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এ গ্রামে আমাকে সবাইবালক-কবি বলে জানে।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—বালক-কবি বলে কেন? কবিতাটবিতা লেখো নাকি?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বললে—লিখি বই কি। না লিখলে কি আমাকে বালক-কবি নাম দিয়েচে? আচ্ছা কাল এনে দেখাব আপনাকে।

পরদিন সে সকাল বেলাতেই এসে হাজির হলো। সঙ্গে একখানা ছাপানো গ্রাম্য মাসিক পত্রিকা গোছের। আমাকে দেখিয়ে বললে—এই দেখুন, এই কাগজখানা আমাদের গাঁ থেকে বেরোয়। এর নাম 'বিশ্ব'। এই দেখুন প্রথমেই 'মানুষ' বলে কবিতাটি আমার। এই আমার নাম ছাপার অক্ষরে লেখা আছে কবিতার ওপরে—বলেই ছোকরা সগর্বে কাগজখানা আমার নাকের কাছে ধরে নিজের নামটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ সত্যিই—লেখা আছে বটে, কবি পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী। তাহলে তো নিতান্ত মিথ্যা বলে নি দেখছি।

কবিতাটি সেই আমায় পড়ে শোনালে। বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান খুব বড়—ইত্যাদি কথা নানা ছাঁদে তার মধ্যে বলা হয়েছে।

অবশ্য কাগজখানা দেখে আমার খুব ভক্তি হলো না। স্টেশনের কাছে একটা ছোট প্রেস আছে এখানে, সেই প্রেসেই ছাপানো—অতি পাতলা জিল-জিলে কাগজ। পত্রিকাখানিকে 'মাসিক', 'পাক্ষিক' ইত্যাদি না বলে 'ঐকিক' বললেই এর স্বরূপ ঠিক বোঝানো হয়। অর্থাৎ যে শ্রেণীর পত্রিকা গ্রামের উৎসাহী লেখা-বাতিকগ্রস্ত ছেলে-ছোকরার দল চাঁদা তুলে একটিবার মাত্র বার করে, কিন্তু পরের বারে উৎসাহ মন্দীভূত হওয়ার দরুন আশানুরূপ চাঁদা না ওঠাতে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়—এ সেই শ্রেণীর পত্রিকা।

তবু আমার ঈর্ষা না হয়ে পারল না। আমি লিখি না, বা লেখার কথা কখনও চিন্তাও করি না। অথচ এতটুকু ছেলে—এর নাম দিব্যি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল। এর ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হলো, মনে ভাবলাম, বেশ ছোকরা তো। অক্ষর মিলিয়ে কেমন কবিতা লিখেছে! সাহিত্যের সমঝদারিত্ব তার মধ্যে ছিল তা আমি জানি। তখনকার আমলের একজন বিশেষ লেখকের বই না থাকলে পল্লীগ্রামের কোনোলাইব্রেরি চলত না। সেই লেখকের এক একখানা বই-এর তিন চার কপি পর্যন্ত রাখতে হত কোনো কোনো বড় লাইব্রেরিতে।

ছেলেটি বলত—ওসব ট্র্যাশ-ট্র্যাশ! দেখবেন ওসব টিকবে না।

এক এক দিন পাঁচুগোপাল আমাকে নিয়ে গ্রামের বাইরে মাঠে বেড়াতে যেত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চোখও তার বেশ ছিল—মাঝে মাঝে মুখে মুখে কবিতা তৈরি করে আমাকে শোনাত। অনেকগুলো কবিতা হলে পর একটা কবিতার বই ছাপাবে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করত। সেই সময় কলকাতার কোনো 'পাবলিশিং হাউস' ছয়-আনা গ্রন্থাবলী প্রকাশ শুরু করে দিল—তার প্রথম বই লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বইখানি স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে পাঁচুগোপাল আমায় এনে দিয়ে বললে—"এ বই নিতে ভিড় নেই। নতুন এসেছে, এক আধ জন নিয়েছিল, কালই ফেরত দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখুন যে যান অমুকের বই-এর জন্যে কি যে মারামারি। ডিটেকটিভ উপন্যাস না রাখলে লাইব্রেরি উঠে যাবে। কেউ চাঁদা দেবে না।" পরের মাসে আর একখানা বই বেরুল। সেখানা আমার কাছে নিয়ে এসে সে বললে—"আমি একটা কথা ভাবছি, আসুন আপনাতে আমাতে এই রকম উপন্যাস সিরিজ বের করা যাক। খুব বিক্রি হবে, আর একটা নামও থেকে যাবে। আপনি যদি ভরসা দেন, আমি উঠে পড়ে লাগি।" আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—"তুমি আর আমি দুজনে মিলে বই-এর কারবার করব, এ কখনও সম্ভব? এ ব্যবসার আমরা কীই বা জানি? তা ছাড়া বই লিখবেই বা কে? এতে লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে হবে, সে পয়সাই বা দেবে কে?"

সে হেসে বললে—"বাঃ তা কেন, বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব। পরকে টাকা দিতে যাব কেন?"

বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসতাম বটে, কিন্তু নিজে কলম ধরে বই লিখব এ ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা আমার কাছে। অবিশ্যি পাঠ্যাবস্থায় অন্য অনেক ছাত্রের মত কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা প্রবন্ধ, এক-আধটা কবিতা যে না লিখেছিলাম তা নয়, বা প্রতিবেশীর অনুরোধে, বিবাহের প্রীতি-উপহারে কবিতা যে দু-পাঁচটা না লিখেছিলাম তাও নয়—সে কে না লিখে থাকে?

সুতরাং আমি তাকে বললাম—"লেখা কি ছেলেখেলা হে যে কলম নিয়ে বসলে হলো? ওসব খামখেয়ালি ছাড়। আমি কখনও লিখি নি, লিখতে পারবও না। তুমি হয়তো পারবে—আমার দ্বারা ওসব হবে না।"

সে বললে—"খুব হবে। আপনি যখন বি.এ. পাস, তখন আপনার কাছে এমন কিছু কঠিন হবে না। একটু চেষ্টা করুন তাহলেই হয়ে যাবে।" তখন বয়েস অল্প, বুদ্ধিসুদ্ধি পাকে নি, তবুও আমার মনে হলো, বি.এ. পাস তো অনেকেই করে, তাদের মধ্যে সকলেই লেখক হয় না কেন? অথচ বি.এ. পাস করা লোকদের ওপর পাঁচুগোপালের এই অহেতুক শ্রদ্ধা ভেঙে দিতেও মন চাইল না। এ নিয়ে কোনো তর্ক আমি আর তার সঙ্গে করি নি।

কিন্তু করলেই ভাল হত, কারণ এর ফল হয়ে দাঁড়াল বিপরীত। দিন দশেক পরে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি সেখানে নোটিশ-বোর্ডে, দেওয়ালের গায়ে, নারকেল গাছের গুঁড়িতে সর্বত্র ছাপানো কাগজ টাঙানো—তাতে লেখা আছে,—বাহির হইল! বাহির হইল!! বাহির হইল!!! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস!

লেখকের নামের স্থানে আমার নাম দেখলাম।

আমার তো চক্ষুস্থির। এ নিশ্চয় সেই পাঁচুগোপালের কীর্তি। এমন ছেলেমানুষি সে করে বসবে জানলে কি তার সঙ্গে মিশি! বিপদের ওপর বিপদ, স্কুলে ঢুকতেই শিক্ষক ছাত্রবৃন্দ সবাই জিজ্ঞেস করে,—"আপনি লেখক তা তো এতদিন জানতাম না মশাই? বেশ! তা বইখানা কি বেরিয়েছে নাকি? আমাদের একবার দেখিয়ে যাবেন।" হেডমাস্টার ডেকে বললেন, তাঁর স্কুল লাইব্রেরিতে একখানা বই দিতে হবে। সকলের নানারূপ সকৌতূহল প্রশ্ন এড়িয়ে চলি সারাদিন—কবে থেকে আমি লিখছি, আর আর কি বই আছে, ইত্যাদি। স্কুলের ছুটির পরে বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

তাকে খুঁজে বার করলাম বাসায় এসে। দস্তুরমত তিরস্কার করলাম তাকে, এ তার কি কাণ্ড! কথার কথা একবার একটা হয়েছিল বলে একেবারে নাম ছাপিয়ে এরকমভাবে বার করে, লোকে কি ভাববে।

সে নির্বাক হয়ে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—"তাতে কি হয়েছে? আপনি তো একরকম রাজিই হয়েছেন লিখতে। লিখুন না কেন!"

আমি বললাম—"বেশ ছেলে বটে তুমি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, তুমি নাম ছাপিয়ে দিলে কি বলে, আর দিলে দিলে একেবারে স্কুলের দেওয়ালে, নোটিশ বোর্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছ, এ কেমন কাণ্ড? নামই বা পেলে কোথায়? কে তোমাকে বলেছিল ও নামে আমি কিছু লিখেছি বা লিখব?"

যাক—পাঁচুগোপাল তো চলে গেল হাসতে হাসতে। এদিকে প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে সকলের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হলো—বই বেরুচ্চে কবে? কত দেরি আছে আর বই বেরুবার?—মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। সে যা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে তার আর চারা নেই। আমি এখন নিজের মান বজায় রাখি কেমন করে? লোকের অত্যাচারের চোটে তো অস্থির হয়ে পড়তে হয়েচে।

সাতপাঁচ ভেবে একদিন স্থির করলাম—এক কাজ করা যাক। সে একটাকা সিরিজের বই কোনোদিনই বের করতে পারবে না। ওর টাকা কোথায় যে বই ছাপাবে? বরং আমি একখানা খাতায় যা হয় একটা কিছু লিখে রাখি—লোকে যদি দেখতে চায়, খাতাখানা দেখিয়ে বলা যাবে, আমার তো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি

কি করব। কিন্তু লিখি কি? জীবনে কখনও গল্প লিখি নি, কি করে লিখতে হয় তাও জানা নেই। কি ভাবে প্লট জোগাড় করে, কি কৌশলে তা থেকে গল্প ফাঁদে—কে বলে দেবে? প্লটই বা পাই কোথায়? আকাশ-পাতাল ভাবি প্রতিদিন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনে। গল্প লেখার চেষ্টা কোনোদিন করি নি। পাঠ্যাবস্থায় সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে সাধ হত, লেখক হতে পারি আর না পারি, একজন বড় বক্তা হতে হবেই।

কিন্তু লেখক হবার কোনো আগ্রহই কোনোদিন ছিল না, সে চেষ্টাও করি নি। কাজেই প্রথমে মুশকিলে পড়ে গেলাম। সাত-পাঁচ ভেবে প্লট সংগ্রহ আর করতে পারি না কিছুতেই। মন তখন বিশ্লেষণমুখী অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায় নি। সব কিছুতেই সন্দেহ, সব কিছুতেই ভয়।

অবশেষে একদিন এক ঘটনা থেকে মনে একটা ছোট গল্পের উপাদান দানা বাঁধল। সেই পল্লীগ্রামে একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্য বধূকে দেখি পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়—কিন্তু দেখা ওই পর্যন্ত। তাঁর পরিচয় আমার অজ্ঞাত এবং বোধ হয় অজ্ঞাত বলেই একটি রহস্যময়ী মূর্তিতে তিনি আমার মানসপটে একটা সাময়িক রেখা অঙ্কিত করেছিলেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক তো, কি হয় দেখি! গল্প শেষ করে সেই গ্রামের দু-একজনকে পড়ে শোনালাম—পাঁচুকেও।কেউ বলে ভাল হয়েচে, কেউ বলে মন্দ হয় নি। আমার একটি বন্ধুকে কলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে গল্পটি শুনিয়ে দিলাম। সেও বললে ভাল হয়েচে। আমি তখন একেবারে কাঁচা লেখক; নিজের ক্ষমতার ওপর কোনো বিশ্বাস আদৌ জন্মায়নি। যে আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটি বড় পুঁজি, আমি তখন তা থেকে বহু দূরে, সুতরাং অপরের মতামতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় কি। আমার কলকাতার বন্ধুটির সমঝদারিত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল—তার মত শুনে খুশি হলাম।

পাড়াগাঁয়ে স্কুলমাস্টারি করি। কলকাতার কোনো সাহিত্যিক বা পত্রিকা-সম্পাদককেই চিনি না—সুতরাং লেখা ছাপানো সম্বন্ধে আমায় একপ্রকার হতাশ হতে হলো। এইভাবে পূজার অবকাশ এসে গেল, ছুটিতে দেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম। পুনরায় ফিরে এসে কাগজ পত্রের মধ্যে থেকে আমার সেই লেখাটি একদিন বার করে ভাবলাম, আজ এটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পত্রিকা আপিসের সামনে এসে পড়া গেল। আমার মত অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন লেখকের রচনা তারা ছাপবে এ দুরাশা আমার ছিল না, তবু সাহস করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেখা যাক না কি হয়, কেউ খেয়ে তো ফেলবে না, না হয় লেখা না-ই ছাপবে। ঘরে ঢুকেই একটি ছোট ঠেবিলের সামনে যাঁকে কর্মরত দেখলাম, তাকে নমস্কার করে ভয়ে ভয়ে বলি—"একটা লেখা এনেছিলাম—"; ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোথাও আপনার লেখা কি বেরিয়েছিল? আচ্ছা রেখে যান, মনোনীত না হলে ফেরত যাবে। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।"

লেখা দিয়ে এসে স্কুলের সহকর্মী ও গ্রামের আলাপী বন্ধুদের বলি—"লেখাটা নিয়ে বলেছে শীগগির ছাপবে।" চুপি চুপি ডাকঘরে গিয়ে বলে এলাম, আমার নামে যদি বুকপোস্ট গোছের কিছু আসে, তবে আমাকে স্কুলে বিলি যেন না করা হয়। কারণ লেখা ফেরত এসেছে এটা তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে সহকর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে। দিন গুনি, একদিন সত্যিই ডাকপিয়ন স্কুলে আমায় বললে—আপনার নামে একটা বুকপোস্ট এসেচে, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসবেন। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নবজাত রচনার প্রতি অপরিসীম দরদ যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা বুঝবেন আমার দুঃখ। এতদিনের আকাশকুসুম চয়ন তবে ব্যর্থ হলো, লেখা ফেরত দিয়েচে।

কিন্তু পরদিন ডাকঘর থেকে বুকপোস্ট নিয়ে খুলে দেখি যে, আমার রচনাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চিঠি। তাতে লেখা আছে, রচনাটি তাঁরা মনোনীত করেচেন, তবে সামান্য একটু-আধটু

অদল-বদলের জন্যে ফেরত পাঠানো হলো, সেটুকু করে আমি যেন লেখাটি তাঁদের ফেরত পাঠাই, সামনের মাসেই ওটা ছাপা হবে।

অপূর্ব আনন্দ আর দিগ্বিজয়ীর গর্ব নিয়ে ডাকঘর থেকে ফিরি। সগর্বে নিয়ে গিয়ে চিঠিখানা দেখাতেই সবাই বললেন—"কারু সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি ওখানে?—আজকাল আলাপ না থাকলে কিছু হবার জো-টি নেই। সব খোশামোদ, জানেনই তো।" তাঁদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, যাঁর হাতে লেখা দিয়ে এসেছিলাম, তাঁর নাম পর্যন্ত আমার জানা নেই। তারপর সে গ্রামের এমন কোনো লোক রইল না, যে আমার চিঠিখানা না একবার দেখলে। কারও সঙ্গে দেখা হলে পথে তাকে আটকাই এবং সম্পূর্ণ অকারণে চিঠিখানা আমার পকেট থেকে বেরিয়ে আসে, এবং বিপন্ন মুখে তাকে বলি—তাই তো, ওরা আবার একখানা চিঠি দিয়েচে, একটা লেখা চায়—সময়ই বা তেমন কই।—হায়, সে সব লেখকজীবনের প্রথম দিনগুলি! সেআনন্দ, সে উৎসাহ, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার বিস্ময় আজও স্মরণে আছে, ভুলি নি। নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে গৌরব এবং আত্মপ্রসাদ নিহিত, লেখকজীবনের বড় পুরস্কার সবচেয়ে তাই-ই। স্বচ্ছ সরল ভাবানুভূতির যে বাণীরূপ কবি ও কথাশিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে নিয়ে যান—তা সার্থক হয় তখনই, যখন পাঠক সেই ভাব নিজের মধ্যে অনুভব করেন। এইজন্য লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি ভিন্ন কখনও কোনো রচনাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

বালক-কবির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সে-ই একরকম জোর করে আমাকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

পাঁচুগোপালের সঙ্গে মাঝে দেখা হয়েছিল। সে তখন চব্বিশ পরগণার কাছে কি একটা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালার হেডমাস্টার। এখনও সে কবিতা লেখে।

সাহিত্যের লক্ষ্য

রাজনীতি বা সমাজ সংস্কারাদির জন্য সঙ্ঘ-সমিতির বৈঠক এবং সাহিত্যসভার মধ্যে ভেতরের পার্থক্য অনেকখানি। পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলিতে সঙ্ঘগঠন, অধিবেশন ইত্যাদি অপরিহার্য। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের প্রাথমিক প্রয়োজনাবলীর সঙ্গেই প্রধানত এই কর্মবিভাগগুলি সংশ্লিষ্ট—বহুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলিত না হয়ে এখানে প্রচেষ্টা সফল হয় না। অন্যদিকে, সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্র স্বরূপ, এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোনো সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক, প্রায় সম্ভবই নয়,—তবুও সাহিত্যসৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি, সাহিত্যিক, আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন,—যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবিমানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দেশ্য-ভাবাবেগ তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, ইহার জন্য আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়ার' আবহাওয়ায় যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি অশ্রু, সমস্যাজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তাঁর লেখার মালমশলা,—কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন, ভালবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত সৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেমও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানব-হৃদয়ের গভীরতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যান; চারিপাশের মানব সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন—এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়স্পন্দনকে তিনি একাত্মভাবে অনুভবের চেষ্টা পান—তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ, সবকালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তাঁর সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে চরম একাকিত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য এবং

প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'কে তলিয়ে বুঝতে হলে বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হলে, তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

সাহিত্যের মূল্য কি ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোট গল্প,নিবিড়-রেশময় একটি 'লিরিক' ঠাস-বুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, যেখানে বাস্তব জীবননাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে—আমাদের জীবনে এ সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার? উত্তর হচ্ছে, দরকার;—অত্যন্ত বেশি দরকার আরও এই জন্যে যে, এই সব প্রশ্ন এখনও আদৌ ওঠে। তেল-নুন—লক্‌ড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি—দু-পাশের এই দুই চরম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটা আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতিঅভ্যাসে বদ্ধ ঝিমিয়ে আসা মনের পক্ষে আকাশস্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানালা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা, এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকীরিত করে। জীবনের এই অতি বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড় করে পায়। দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা, ক্লেদ, গ্লানি পেছন পড়ে থাকে—মানুষ খানিকক্ষণের জন্য অন্তত খণ্ডকাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনার স্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককেঅত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরও অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশি পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে—যে নাকি অন্তত কোনো কোনো ক্ষণের জন্যও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত;—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা-সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ কালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে,—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভববৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানত জীবনসংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি জোগায়, এবং রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছে—অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশনে, যে মূল লীলায় আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হলো উৎপত্তি,—সুখ দুঃখ, হর্ষ বেদনা, প্রেমকীর্তি, ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যেপে এবং সব ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দসত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরেছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন, তার মর্ম এই যে—আমাদের ধরণী ভারি সুন্দর; একে বিচিত্র বললেই-বা এর কতটুকু বোঝান হলো। আমাদের এইদৃষ্টিটি বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে 'রিয়্যালিটি' বলে ভুল করি, জীবননদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না। তাই তো কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার—শুক্‌নো মিথ্যা-বাস্তবের পাঁক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোনো মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও,—এর শিল্পের বুননিতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তা হলে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনেরই হয়ে উঠবে; রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমতি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এরকম কোনো আদর্শের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিক চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানীর জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রস-সাহিত্যের উপভোগ সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা

'হরিজন'—সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন' মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপ তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদগ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এক্ষেত্রেও অধিকারীভেদ মানতে হয়। বাস্তবিক পক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জ বা অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথা অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানত 'ইন্‌টেন্‌সিটি'র দিক দিয়ে—বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা—যাতে তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দু'দিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবীকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচে নি, বড় বড় নামওয়ালা কথাসাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন হালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়াপাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু-দশজন সাহিত্যরসিক, দু-পাঁচজন পণ্ডিত, বৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথা-সরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন কুইকসোট কে পড়ে? চসার, দান্তে, মিল্টন, এঁদের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এদের পাতা ওলটায় না—সকলে তো কাব্যপ্রিয় নয়—কিন্তু অত বড় যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বালজাক, তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যেক'খানা আজকাল লোকে সখ করে পড়ে? স্কট, হেন্‌রি, জেমস, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে; অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—"বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত' প্রভৃতি বড় বড় গাল ভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেন্টেন্স রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি। পার্ক স্ট্রীটে ওয়েলডন লাইব্রেরি একটা খুব বড় বিলিতী ও আমেরিকান উপন্যাস আমদানীকারক লাইব্রেরি—অনেক সাহেব মেম, আমাদের দেশের লোক নভেল পড়বার জন্যে তার সভ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু তিন বছর অন্তর বইয়ের আলমারি থেকে সমস্ত পুরাতন বই নিষ্কাশিত করে দিতে হয়—সস্তায় সেগুলো পুরানো বইয়ের দোকানদারেরা নিলামে ডেকে নিয়ে যায়। লোকের হুজুগ নতুন বই চাই, এ মাসের যদি হয় তবে আর ও মাসের চাইবে না—প্রায় সেই অবস্থা। ভালমন্দর বিচার একেবারে যে নেই তা নয়, কিন্তু খুব বেশি নেই।

ওপরের সব কথা স্বীকার করে নিলেও একটা কথা থেকে যায়। যে সাহিত্যটবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসার বিবাগী, ঊর্ধ্ববাহু, মৌনী যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসাবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি, মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথা-সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনেরসত্য চিত্র হিসাবে তার মূল্য কিছুই থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এর সকল বাস্তবতাকে—এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখ দুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ির পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষ যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান। কথাশিল্পী যা

নিজের চোখে দেখছেন, তাই তাঁকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোনো ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোনো দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা সুষ্ঠু করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণথেকে যাবে।

'এমা রোভারি'-র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে!

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয়সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুরসত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিশ্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে, অনেক পরিমাণে সহনীয় হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণিকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দু একটি কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্য প্রোপাগান্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোনো সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগান্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে—একটা বিশেষ সীমার ভেতর থেকে—করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোনো প্রচার বিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফলেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনই, যখন এ অপরতর কোনো উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে 'স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ'—অনেক কিছুর মত এ ক্ষেত্রেও। তারপর আমরা আনতে পারি—সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি, শ্লীলতা অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবনকাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানস চেতনায় পাই। এইজন্য অদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখনই তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই শুধু তা হয় আর্ট। তখন তা আর শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সংকীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণবুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রসস্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কি জীবনে, কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিতনীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে, বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং যদিও মানুষের জীবন, এত বিচিত্র ও মোহনীয় রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবল এই-ই নয়। তা ছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন ও সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত, সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি!

['দেশ'-সাপ্তাহিক ৫ম বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৯ এপ্রিল ১৯৩৮, ২৬ চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত—নি.স.]